শ্রীশোভা হুই

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

৺শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর চরণে অর্পিত হইল।

নিশ্চেতন মন

নিশ্চেতন মন

১

অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় তখন পৃথিবী আভাময়। সবে মাত্র সন্ধ্যা নেবে আসছে ধরণীর বুকে। চারিদিক শঙ্খবাদ্যে মুখরিত, এই স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশের মধ্যে রায়বাহাদুর মনোজ মিত্র ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় নিমীলিত নয়নে যেন কিসের চিন্তায় বিভোর। তাঁর গভীর বিষাদাচ্ছন্ন মুখ দেখলেই বোঝা যায়, সন্ধ্যার এই প্রশান্তি তাঁর হৃদয়কে এতটুকু স্পর্শ করতে পারে নি। সংসারে মানুষের যা কাম্য তাই তিনি পেয়েছেন। টাকা, পয়সা, গাড়ী. বাড়ী, মান, যশ, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে—পরিপূর্ণ সংসার, কোথাও কিছু অভাব নেই। তবে কেন তিনি এত বিচলিত? এই জীবন-সায়াহ্নে এত চিন্তাগ্রস্ত?

গৃহিণী উমাসুন্দরী সন্ধ্যাবাতি জ্বেলে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। কি যেন বলবার জন্যে ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করলেন, কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে নীরব হয়ে গেলেন। কেবল আকাশের দিকে চেয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তিনি নিজেকে ঘোরতর অপরাধী মনে করতে লাগলেন। তাঁরই দোষে স্বামীর আজ এত চিন্তা। কোন সান্ত্বনা দেবার অধিকার নেই তাঁর। এ অশান্তির জন্যে দায়ী তো তিনিই। হঠাৎ মনোজবাবু চোখ দুটো ঈষৎ খুলে বললেন, "জয়া এখনও এল না? পুলিশের লাঠি যদি ওর পিঠে আজ না পড়ে তো ভাগ্যি ভালো। তুমি বারণ করতে পারলে না মেয়েটাকে?"

"আমি বারণ করলে শুনবে? বারণ তো করি আমি।"

"এখন শুনবে কেন? ছোট থেকে ও-পথ দেখালে তুমিই, তোমারই শিক্ষায় ওরা এ রকম হয়েছে, তখন কত বারণ করেছি, গ্রাহ্য করেছ আমার কথা? ছেলে মেয়ে নিয়ে দিন রাত বাইরে হৈ-হৈ করেছ, এখন সামলাও এবার তাদের।'

রায়বাহাদুরের এ অভিযোগের কোন উত্তরই তিনি দিলেন না। মাথা পেতে নিলেন সমস্ত অভিযোগ, পিতা ছিলেন বৃটিশের আমলে কংগ্রেস-সেবক। চিরদিন তিনি দেশের সেবায় নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। মা ছিলেন তাঁর এক ধনী রাজ-কর্মচারীর কন্যা, পিতার সঙ্গে তাঁর একটুও মিল ছিল না মনের, কারণ দুজনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল একেবারে বিপরীত। মা তাঁর চাইতেন সুখে স্বচ্ছন্দে আরামে জীবনটা কাটিয়ে দিতে। দেশের ও দশের কথা তিনি মনেই স্থান দিতে চাইতেন না। পিতাও ছিলেন সবল-চিত্ত তেজী মানুষ। মায়ের স্বার্থপরতার ধার দিয়েও যেতেন না। অধিকাংশ সময়ই থাকতেন জেলে, কাজেই মা বাপের বাড়ীতেই থাকতেন। উমাসুন্দরী মামার বাড়ীতেই মানুষ। উমাসুন্দরীর মা স্বামীর মত বা পথ থেকে সরিয়ে এনে কন্যাকে নিজের মনের মত ক'রে মানুষ করেন, বিয়েও দেন হাকিমের সঙ্গে। কিন্তু মেয়ের মন হলো বাপের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাঁরই মত দৃঢ়চিত্ত। ফলে চিরদিন স্বামীর সঙ্গে বিরোধিতা করেছেন তিনি, তোয়াক্কা করেন নি সরকারী চাকরীকে। কাজেই গৃহেও ছিল না কোন শান্তি। মনোজবাবুকে চাকরীর কাজে ঘুরতে হয়েছে দেশ-দেশান্তরে। উমাসুন্দরী ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকতেন কলকাতাতেই। সভা সমিতি কোনটাই বাদ দিতেন না তিনি, গরীব-দুঃখীদের মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করতেন। দ্বিপ্রহরে নিজের বাড়ীতেই দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের নিয়ে স্কুল করতেন। স্কুল কলেজ বন্ধ থাকলে নিজের ছেলে-মেয়েদেরও দিতেন পড়াতে। চাঁদা তুলে বহু গরীব-দুঃখীর উপকারও করেছেন প্রচুর। সময় সময় খদ্দর নিয়ে দ্বারে দ্বারে বিক্রীও করেছেন। এক কথায় স্বামীর সরকারী চাকরীর ভয়ে দেশের কাজ করতে এক সময়ও দ্বিধা বোধ করেন নি, কিন্তু এখন করেন। পরাধীন ভারতে স্বাধীন ভারতের যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন, তা হয়েছে সম্পূর্ণ বিফল। স্বপ্ন স্বপ্নই র'য়ে গেল। যে নেতাদের নামে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা নামাতেন, আজ তাঁদের মতিভ্রম দেখে হতাশ হয়ে পড়েছেন। এর জন্যেই কি সারাজীবন লড়াই ক'রে এলেন

স্বামীর সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে—এক কথায় মামার বাড়ীর আর শ্বশুর-বাড়ীর সকলের সঙ্গে? এই কি স্বাধীন দেশের রূপ? এর জন্যেই লাখ লাখ লোক প্রাণ দিয়েছে অকাতরে? ঢং ঢং ক'রে ঘড়িতে সাতটা বাজল। মনোজবাবু খাড়া হয়ে উঠে বসলেন। মেয়েটা কোন্ সকালে এক কাপ চা খেয়ে গেছে, এখনও পর্যন্ত দেখা নেই। উদ্বাস্তু-উচ্ছেদ বিল নিয়ে আমাদেরও উদ্ব্যস্ত ক'রে দিলে, ঠিক সময় খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রোদে রোদে টো-টো ক'রে ঘুরে শরীর করেছে প্যাঁকাটির মত, তারপর ঐ মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে মনে করছ? না, এ রকম হৈ-হৈ ক'রেই রাস্তায় ঘুরবে চিরকাল? ক্ষুব্ধ কণ্ঠে এক নিশ্বাসে কথাগুলি স্ত্রীর উদ্দেশ্যে ব'লে রায়বাহাদুর চুপ করলেন। একটু নীরব থেকে আবার বললেন, "হতভাগাগুলোও নিশ্চয় মেতেছে বাস্তুহারাদের নিয়ে, নয়? পিস্ কমিটি! বাস্তুহারা বাঁদরদের কোন কাজকর্ম নেই, কেবল মাতামাতি। ওদের জন্যে শান্তি আমার নেই এ বয়েসেও। নেচে নেচে বেড়িয়ে দেশ উদ্ধার হচ্ছে—যত সব কুলাঙ্গার।"

চুপ ক'রে রইলেন গৃহিণী, একটি কথারও উত্তর দিলেন না। তাঁরও অশান্তি কি কম! ছোট থেকে ভালো কথাই শিখিয়েছেন, ভালো শিক্ষাই দিয়েছেন, পরে এর জন্যে যে এত অশান্তি পাবেন তা বুঝতে পারেন নি।

রাত্রি সাড়ে নটায় ফিরল মেজো ভাই সুশীল আর জয়া। রায়বাহাদুর তখনও প'ড়ে ছিলেন ইজিচেয়ারে, আর গৃহিণী দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন পথ চেয়ে। ছেলে-মেয়েকে দেখে চুপি চুপি বললেন, হাত পা ধুয়ে খেতে বসতে। জয়া আস্তে আস্তে বললে, "মা, বাবা খান নি?"

"না, তোদের জন্যে ভেবেই অস্থির।"

"সে কি, দুপুরেও খান নি ভাত?"

"দুপুরে অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে চাট্টি খাইয়েছি, কিন্তু বিকেলে চা কিংবা এত রাত পর্যন্ত ভাত কিছু খাওয়াতে পারি নি। হ্যাঁরে, অনিল এল না?" জিগ্যেস করলেন গৃহিণী।

"বড়দাকে, মা, গ্রেপ্তার করেছে।"

"গ্রে-প্তা-র!"—একটু চিন্তা ক'রে বললেন তিনি।

"এ কথা আর তোমার বাবার কানে তুলো না, ধীরে সুস্থে কাল সকালে বললেই হবে। তোরা যা, ওঁকে ডেকে নিয়ে খেতে ব'স্।"

"যাচ্ছি মা যাচ্ছি।" তারপর সুশীলের দিকে চেয়ে বললে জয়া, "ছোট্‌দা, তুমি হাত মুখ ধুয়ে খাবার ঘরে যাও, আমি যাচ্ছি বাবাকে নিয়ে।"

তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে জয়া রায়বাহাদুরের কাছে এসে দাঁড়াল। বললে আবদেরে সুরে, "বাবা, আমরা এসেছি। তুমি কি আমাদের ওপর রাগ করেছ বাবা?"

গ'লে গেলেন রায়বাহাদুর, বললেন তিনি, "না মা, রাগ করি নি, তবে—সারাদিন ঘুরে ঘুরে অসুখে পড়বি। নাওয়া-খাওয়া তো ঠিকমত করতে হয়?"

অনুযোগ ক'রে বললে জয়া, "বাবা, তুমি কেন খাও নি আমাদের জন্যে? এ তোমার ভারি অন্যায়।"

রায়বাহাদুর মৃদু হেসে বললেন, "তোরা না খেয়ে থাকবি, আর আমি সাত তাড়াতাড়ি খেয়ে ব'সে থাকব, কেমন?"

"বিকেলের চা খাও নি কেন? এ রকম করলে আমি কিন্তু খুব রাগ করব তোমার ওপর।"

খাবার টেবিলে সব একসঙ্গে মিলিত হলো সারাদিন পর। মনোজবাবুর নজর পড়ল, টেবিলে তো বড় ছেলে নেই! বললেন তিনি, "অনিল কোথায় রে? তাকে তো দেখছি না!"

ভাই-বোন একটু ইতস্তত করতে লাগল, গৃহিণী তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, "সারাদিন ঘুরে ঘুরে অনিলের মাথা ধরেছে অসম্ভব, তাই শুয়ে পড়েছে।"

মনোজবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ব্যগ্র স্বরে বললেন, "খাবে না কিছু?"

"তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না, তার ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছি।"

অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন রায়বাহাদুর, "মাথার আর অপরাধ কি? এখন চারদিকে অসুখ-বিসুখ হচ্ছে, একটু সাবধানে থাকবে না তো?" তারপর সুশীল ও জয়াকে জিগ্যেস করলেন, "কি রে, তোদেরও মাথা ধরে নি তো?"

মাথা নেড়ে তারা জানালে যে, ধরে নি। খাওয়ার শেষে হাত-মুখ ধুয়ে মনোজবাবু স্ত্রীকে বললেন, "ভিক্‌স্‌টা নাও, একটু ঘ'ষে দিলে মাথাধরা সেরে যাবে। দেখি ছেলেটার আবার কি হলো?" ব'লে অনিলের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। গৃহিণী প্রমাদ গুনলেন। অনিলকে দেখতে না পেলে এখনই প্রলয় কাণ্ড সুরু হবে। তাড়াতাড়ি তিনি স্বামীর সামনে পথ আগলিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন তাঁকে, "যাও তুমি, এত রাতে আর তোমাকে ওর জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আমিই ভিক্‌স্‌ মালিশ ক'রে দিচ্ছি।"

জয়া সামনেই ছিল, মাতার সঙ্গীন অবস্থা বুঝতে পেরে, বললে রায়-বাহাদুরকে, "বাবা, এস আমার সঙ্গে। আমাদের মিটিংয়ের কথা শুনবে চল। আজ খুব সাক্‌সেস্‌ফুল মিটিং হয়েছে। কিছুতেই বিল পাস করতে দেব না আমরা, গভর্ণমেণ্ট ভয় পেয়ে যাবে নিশ্চয়। জনমত কি অগ্রাহ্য করতে পারবে? বল তুমি?"

কি বলবেন তিনি? মেয়ের একটি কথাও সমর্থন করেন না মনে মনে। জোর ক'রে যারা অবৈধ ভাবে জমি দখল করেছে, তাদের উচ্ছেদ করাই দরকার—এটাই তাঁর মত।

"বাবা চুপ ক'রে রইলে যে? তোমার মত কি বললে না?"

"তোমার মতের সঙ্গে আমার মত মিলবে না মা।"

"নাই বা মিলল, তবু সকলের মত জানা দরকার আমাদের।"

"আমার মত মা, যারা ক্যাম্পে রয়েছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কদর্য জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের ব্যবস্থা আগে হওয়া দরকার। বাস্তবিকই যারা নীড়ি তাদের কোন ব্যবস্থা হয় নি আজ পর্যন্ত। যারা পরের জমিতে কলোনি গ'ড়ে তুলেছে, তাদের বেশির ভাগেরই কলকাতায়

মাথা গোঁজবার জায়গা আছে, বিনি পয়সায় খানিকটা জায়গা দখল করবার লোভে এরা জোর ক'রে দখল করেছে পরের জায়গা।"

জয়া বললে, "কথাটা ঠিকই, কিন্তু ওদের মধ্যে যথার্থ দুঃস্থ রিফিউজি আছে বাবা।"

"তা ঠিক মা, তবে বেশীর ভাগই প'ড়ে রয়েছে .প্ল্যাটফরমে, ফুটপাতে আর ক্যাম্পে।"

এমন সময় গৃহিণী এসে দাঁড়ালেন। ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে এগারোটা বেজে গেল। বললেন তিনি, "অনিল ঘুমুচ্ছে, এগারোটা বাজল, যা জয়া, শুয়ে পড়্গে যা।"

২

প্রত্যূষে সবেমাত্র তরুণ অরুণদেব রক্তিম নয়ন দুটি মিলতে আরম্ভ করেছেন। মুরগী ডাকার পর কাক ডাকতে আরম্ভ করেছে কা-কা ক'রে। অন্য পাখীগুলিও কিচির-মিচির করছে তার সঙ্গে। পথে দু-একটা পথিকও দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার মিলিয়ে আলো উঠছে ফুটে। তার সঙ্গে সমস্ত জীব-জগতেরও জড়তা যাচ্ছে কেটে। সব চঞ্চল হয়ে উঠছে। চঞ্চল হয়ে উঠলেন মিত্তির-গৃহিণী, ধনীর ঘরণী তিনি, কাজেই এত ভোরে তাঁর কাজের চঞ্চলতা নেই; কিন্তু মনের চঞ্চলতাই তাঁকে অস্থির ক'রে বিছানা থেকে নাবিয়ে দিলে। দরজা খুলে জোড়হাতে সূর্যদেবকে নমস্কার জানিয়ে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে ভোরের অপূর্বসুন্দর আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। আকাশে তখন বর্ণের সমারোহ। লাল, গোলাপী, সাদা রঙের মাতামাতি। সমস্ত আকাশ বর্ণপ্রভায় প্রভাময়। গৃহিণী আনতমস্তকে বারে বারে প্রণাম জানালেন সকল দেবতার চরণে, মনে মনে প্রার্থনা করলেন, "ঠাকুর, ছেলে-মেয়েকে ঠিক পথে চালিও। তারা যেন মানুষ হয়।" পৃথিবীর মাতৃজাতির সেই চিরন্তন প্রার্থনা। এপাশে গৃহিণী বারান্দায় প্রার্থনা জানাচ্ছেন, ওপাশে কর্তা মুখ ধুয়েই গেছেন ছেলের খোঁজে। মাথা ধরেছে ছেলেটার। মন তাঁর অস্থির

হয়ে আছে ঐ জন্যে। কিন্তু ঘরের সামনে এসেই চক্ষুস্থির। কোথায় অনিল? ঠেলা দিতেই দরজা গেল খুলে। রায়বাহাদুর ঘরের এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখলেন কয়েক মিনিট; তারপর ভাবলেন—মাথা ব্যথা, সারারাত ছট্‌ফট্‌ করেছে, হয়তো বাথরুমে গেছে এখন। চ'লে এলেন তিনি বারান্দায়, যেখানে গৃহিণী দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রার্থনা জানাচ্ছেন ভগবানের পায়ে। রায়বাহাদুর বললেন, "কোথায় অনিল? দেখলাম না তো? কোথায় গেল সে এত ভোরে?"

গৃহিণী দেখলেন, ধরা প'ড়েই গেছেন যখন তখন সত্যি কথাটাই বলা যাক। বললেন অস্ফুট স্বরে, "কাল তাকে অ্যারেস্ট করেছে।"

"অ্যারেস্ট করেছে?" কর্তা কয়েক মিনিট হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অ্যারেস্ট হওয়া এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, হামেশাই হচ্ছে ঘরে ঘরে, এতে মুষড়ে পড়ে না কেউ। কিন্তু রায়বাহাদুর একেবারে মুষড়ে পড়লেন। কারণও ছিল অবশ্য। অনিল এম. এস-সি. পাস ক'রে বেকার ব'সে আছে দু বছর। কিছুতেই কোন চাকরী জুটছে না তার। বহু চেষ্টায়, বহু সুপারিশে তিনি একটা সরকারী চাকরী জোগাড় করেছেন, এমন সময় এ কি কাণ্ড ক'রে বসল অনিল? পয়লা তারিখে যার জয়েন করবার কথা সরকারী অফিসে, সে কিনা সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে ধরা পড়ল? এমন ভালো চাকরীটা বোধ হয় হাতছাড়াই হয়ে গেল। রায়-বাহাদুরের শরীর রাগে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। বললেন তিনি রোষ-কম্পিত স্বরে, "দেখ, তোমার অনেক অবাধ্যতা সহ্য করেছি জীবনভোর, কিন্তু আর সইব না। এ সব পথ তুমিই চিনিয়েছ ওদের। ঐ সব ফাঁকা বুলি আওড়াতে কোথা থেকে শিখল শুনি?" ব'লে রায়বাহাদুর সে স্থান ত্যাগ করলেন।

গৃহিণী স্বামীর অনুযোগের কোনও প্রতিবাদ করলেন না। ওদের জন্যে চিন্তা কি তাঁরই কম? কি হবে ওদের ভবিষ্যৎ কে জানে! স্বাধীন দেশের এই তো রূপ! অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, যে দিকে তাকানো যায় নিঃস্ব মানুষের হাহাকার। ছেলে-মেয়েরও জীবন হয়ে যাচ্ছে ছন্নছাড়া, কারুর একটা স্থিতি হচ্ছে না। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে লড়াই ক'রে এই তো হলো ফল?

কম্যুনিস্ট ব'লে কোথাও চাকরী হচ্ছে না। মেয়েটাও বড় হয়েছে, লেখাপড়াও শেষ হয়েছে—এখন বিয়ে দেওয়া দরকার। কর্তাও বুড়ো হয়েছেন, কখন কি হয় তার ঠিক নেই। ভালো ক'রে বুঝিয়ে ওদের বলতেই হবে।

চায়ের টেবিলে গৃহিণীই কথাটা পাড়লেন। বললেন সুশীলের দিকে চেয়ে, "তোমরা দিনরাত হৈ-হৈ ক'রে ঘুরছ, কিন্তু একটা চাকরী-বাকরী করা তো দরকার। নিজের পায়ে ভর দিয়ে না দাঁড়ালে কি চলে ?"

মায়ের কথা শুনে সুশীল অবাক হয়ে গেল। দেশের কাজে ঘোরাকে বাবাই চিরকাল হৈ-হৈ নাম দিয়েছেন, কিন্তু মাও বলছেন এ কথা ? মায়ের উৎসাহ পেয়েই তো তারা চিরকাল উৎসাহিত। তারা দেশসেবা করে ব'লে মায়ের কত গর্ব, আর আজ বলছেন মা এ কথা ? জয়াও মায়ের রুষ্ট মুখের দিকে চেয়ে রীতিমত ভাড়কে গেল। গৃহিণী আবার আরম্ভ করলেন, "নিজেদের ভবিষ্যৎটা তো একবার চিন্তা করতে হবে ?"

জয়া বললে, "দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গেই যে আমাদের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে।"

"তা আছে সত্যি, কিন্তু তাই ব'লে তো ব'সে থাকলে চলবে না। এখন আর কোন আন্দোলনে তোমরা যোগ দিও না। একটা চাকরী যাতে হয় তার চেষ্টা করা তোমার দরকার, সুশীল।"

জয়া চোখ বিস্ফারিত ক'রে বললে, "একেবারে পলিটিক্স ছেড়ে দেবে ?"

"নিজের কাজ বজায় রেখে যদি করতে পার তাতে আমাদের আপত্তি নেই।"

রায়বাহাদুর এতক্ষণ চুপ ক'রে কথাবার্তা শুনছিলেন। গৃহিণীর কথা শুনে বললেন, "নিজের কাজ ক'রে পলিটিক্স করা চলে না। হয় নিজের কাজ কর, নয় পলিটিক্স কর। তা ছাড়া যেভাবে তোমরা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা দাও, চাকরী তোমাদের পাওয়াও মুস্কিল।"

সুশীল বললে, "নিজের কাজ মানে তো বুঝতে পারলাম না বাবা ?"

"তা বুঝবে কেন? নিজের কাজ মানে—স্বোপার্জিত অর্থে অন্নের সংস্থান।"

"অন্নের সংস্থান ক'রেও বাইরের কাজ করা চলে।"

"না, তা চলে না। দিনরাত যদি এ নিয়েই মাথা ঘামাবে, তবে পরের চাকরী করবে কখন ?"

সুশীল বললে, "দেশের যা হয় হোক, একেবারে চোখ বন্ধ করব ?"

"চোখ তো এতদিন খুলেই ছিলে, তাতে কি হলো ?"

"হয়েছে বৈকি ? দেশ স্বাধীন হলো তো ?"

"তোমরা তো বল—দেশ স্বাধীনই হয় নি।"

"আহা, আমরা বলি অন্যভাবে। দেশ স্বাধীন হ'লে দেশের লোকের যা সুবিধে সুযোগ ভোগ করা দরকার তার একটুও হয় নি। এখন যখন আমাদের নিজেদের সরকার, তখন আন্দোলন ক'রে আদায় করতে হবে সব।"

"চাকরী করলে আন্দোলন করবেই বা কখন আর বক্তৃতাই বা দেবে কখন ?"

"বক্তৃতা তো রোজ নয়।"

গৃহিণী বললেন সুশীলকে, "আচ্ছা, তুমি একটা চাকরী খুঁজে বের কর, তারপর কি করবে আর কি না-করবে সে পরে হবে। শ্যাম-কুল দুই-ই যদি বজায় রাখতে পার, ভালোই।"

কর্তা বললেন, "শ্যাম-কুল দুই-ই বজায় রাখা সোজা নাকি ? সব ছেড়ে একমনে কাজ না করলে কখনও চাকরী বজায় থাকে ?"

গৃহিণী বললেন, "আচ্ছা, হোক তো একটা চাকরী, তারপর অন্য কথা।"

চা খাওয়া শেষ হতে কর্তা উঠে গেলেন খবরের কাগজ হাতে নিয়ে। গৃহিণীও সংসারের কাজে মন দিলেন। উঠল না কেবল ভাই বোন। জয়া বললে সুশীলকে, "সত্যি ছোট্‌দা, একটা কাজকর্ম করা দরকার। কাজ করলে হাতে টাকাও তো আসে। যে কাজই করতে যাই টাকার অভাবে এগোয় না। তুমি একটা চাকরী জুটিয়ে নাও, আর আমিও নিই। সমিতিতে প্রায় তিন-চার মাস চাঁদা দিতে পারছি না। মায়ের কাছে চাইতেও লজ্জা করে।"

"আমারও তো একই অবস্থা। সেবক-সমিতিতে একটি পয়সাও দিতে পারি না।"

"বড়দার চাকরীর ভরসায় ছিলাম, তাও তো ভেস্তে গেল। না গেলেই পারত রিফিউজিদের সঙ্গে!"

সুশীল ঘাড় নেড়ে বললে, "বড়দার অন্যায়ই হয়েছে। গভর্ণমেণ্টের ভালো চাকরীটা বোধ হয় গেল।"

জয়া জোর দিয়ে বললে, "বোধ হয় কি—নিশ্চয়ই ও চাকরী আর বড়দা পাবে না, দেখে নিও।"

ঘাড় নেড়ে বললে সুশীল, "সত্যিই বড়দার যাওয়া খুব অন্যায়।"

৩

পরদিনই অনিল ছাড়া পেল, কিন্তু ভাই-বোনের মতি দেখে অবাক হয়ে গেল। তারপর আরও অবাক করলেন তার মা। মা বললেন, "বাবা অনিল, এখন কোন আন্দোলনে যোগ না দিয়ে চাকরীর খোঁজ কর।"

"কেন মা, চাকরী তো আমার ঠিকই আছে।"

"ও গভর্ণমেণ্টের চাকরী, ওখানে তোমার হবে না, বিশেষ ক'রে এসব ঘটনার পরে। তার চেয়ে তুমি অন্য জায়গায় চেষ্টা কর।"

অনিল খানিকক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সামনের দিকে। ব্যাপার কি? চব্বিশ ঘণ্টাতেই এদের এ পরিবর্তনের মানে? বাবা চিরকালই এ সবের বিরুদ্ধে; কিন্তু মা সুশীল, এমন কি জয়া শুদ্ধ বললে—তোমার রিফিউজিদের সঙ্গে না যাওয়া ভালো ছিল!

এত বড় একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে না সে? চাকরী হবে ব'লে গভর্ণমেণ্টের সব অন্যায় সহ্য করতে হবে! দরকার নেই আমার সরকারী চাকরীর।

তিনতলার একটি নির্জন ঘরে অনিল থাকে। একটু পর সুশীল আর জয়াও এল সেখানে। অনিল চোখ বন্ধ ক'রে লম্বা হয়ে প'ড়েই রইল।

তাদের উপস্থিতির কোন আমলই দিলে না। তার রাগ হয়েছিল সকলের উপর। স্বার্থপরের মত সে নিজের সুখ দেখে নি ব'লেই তার বিরুদ্ধে এত অনুযোগ! চাকরী করা দরকার তা সে বোঝে। এ জন্যেই সরকারী চাকরীতেও মত দিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সইল না। যাক, যে ক'রে হোক একটা বেসরকারী অফিসে চাকরী সে খুঁজে নেবেই। সব কাজ বাদ দিয়ে কাল থেকে সে উঠে-প'ড়ে লাগবে।

"দাদা, ও দাদা, ঘুমুলে নাকি?"—জয়া ডাকতে লাগল।

সুশীল বললে, "ঘুমুচ্ছে না—ছাই, ঘুমোবার ভান করছে।"

জয়া বললে, "দাদা, ও দাদা, তোমার সঙ্গে একটা যুক্তি করতে এসেছি। টালিগঞ্জের কলোনিতে কি তোমার আজ যাবার কথা আছে? আমি কিন্তু আজ যাব অন্য দিকে।"

অনিল এবার চোখ খুলে বললে, "না, আমি আর কোথাও যাব না। হয় চাকরী, না হয় মৃত্যু।"

"ও বাবা, তোমার চাকরীর ওপর হঠাৎ এত ঝোঁক! রীতিমত ভাবিয়ে তুললে যে।"

"চিরকাল বাপের ঘাড়ে খাব নাকি? হাত-খরচের দু-একটা টাকার জন্যে এখনও মায়ের কাছে হাত পাততে হয়। চাকরীর চেষ্টা অনেক আগেই করা উচিত ছিল। যাক, এখন থেকে প্রথম কাজ আবার চাকরী খোঁজা।"

জয়া পরিহাসের কণ্ঠে বললে, "ওঃ, বাবার একেবারে সুপুত্তুর! এত বিবেচনার কথা শিখলে কোথা থেকে?"

সুশীল একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "যাক, বাঁচা গেল, বড়দা উপায় করলে আমরাও পয়সার মুখ দেখব।"

জয়া বললে, "হাসি ঠাট্টা কিংবা রাগের কথা নয়। আমাদের এখন প্রত্যেকের নিজের পায়ে দাঁড়ানো দরকার। মা-বাবার ওপর আমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে! তা ছাড়া তাঁদেরই পয়সা নিয়ে দয়া-দাক্ষিণ্য করা কি আমাদের উচিত?"

অনিল ফোঁস ক'রে উঠল, "তোরা হঠাৎ রাতারাতি এতটা ন্যায়পরায়ণ হয়েছিস দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। তবে আমাকেও একটু সময় দিতে হবে তো? আসা মাত্র বাবা রাগ ক'রে মুখে ফিরোলেন, মা বললেন চাকরী খুঁজে নিতে, আর তোরা দিচ্ছিস লম্বা লম্বা লেকচার। চাকরীটা হাতছাড়া হলো ব'লে তোদের আর দুঃখের সীমা নেই। অবশ্য বাবার হওয়া স্বাভাবিক, কোনদিনই তিনি এসব কাজকে সাপোর্ট করেন নি, কিন্তু তোরা হঠাৎ বদলে গেলি কেন?"

জয়া বললে, "বড়দা, আমার কথা শুনলে বুঝতে পারবে—হঠাৎ আমরা বদলিয়ে গেছি কেন? সেদিন রাত্রে ফিরে এসে বাবা আর মায়ের অবস্থা দেখে, সত্যি—আমরা অনুতপ্ত হয়েছি। সারাদিন বাবা শুয়ে ছিলেন ইজিচেয়ারে। দুপুরে দুটি ভাত কোন রকমে মুখে দিয়েছিলেন, কিন্তু বিকেলে চা খাবার কিছু খান নি। মা বাবার অবস্থা দেখে সারাদিনই ভীষণ অশান্তিতে কাটিয়েছেন। আমরা এসে বাবার মুখে দেখলাম গভীর দুশ্চিন্তার আর মায়ের মুখে বিষাদের চিহ্ন।"

অনিল জয়াকে থামিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, "তোর ওসব নাটকীয় কথা বুঝতে পারলাম না। গেছি একটা সৎকাজে, তাতে একজন দুশ্চিন্তায় আর একজন বিষাদে পাগল! আর তুইও তাঁদের সঙ্গে অস্থির হয়ে পড়লি?"

"বড়দা, তুমি চুপ কর একটু, আমায় বলতে দাও। মায়ের ইচ্ছে—সব সময় পরের কাজে না ঘুরে নিজেরা একটু স্থিতি হই আর অবসর সময় দেশ নিয়ে মাথা ঘামাই। আমাদের ভবিষ্যৎও তো দেখতে হবে! আজ না হয় বাবা বেঁচে আছেন, চিরকাল তো তিনি বেঁচে থাকবেন না। তোমাদের উপায়ী দেখে গেলে তিনি শান্তি পাবেন।"

অনিল হেসে বললে, "আমরা করব উপায়, আর তুই কর্ বিয়ে। এইটাই তোর চাকরী।"

"যাঃ, কি যে বল বড়দা তুমি!"

"ঠিকই বলছি বোন। তুই যখন মা-বাবার পক্ষে এত ওকালতি করছিস, তখন মনেতে হয়েছে তোর অন্য ব্যাপার।"

"যা খুসী মনে করতে পার, তাতে আপত্তি নেই। যাই, এখন বেলা হয়েছে অনেক, আজ আবার একজিকিউটিভ কমিটির মিটিং, তার আগে একবার বেলাদির সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

সুশীলও উঠে দাঁড়াল, বললে, "আমার আবার আজ সেবক-সমিতিতে কয়েকটি নতুন ছেলে আসবে। তাদের ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে কাজ করে।"

জয়া বললে, "সাবধান ছোট্দা, নতুন লোক বিবেচনা ক'রে ঢুকিয়ো। এমনি আসছে, না, কারুর থ্রু দিয়ে?"

সহাস্য মুখে বললে সুশীল "নিশ্চয়ই আমাদের সেক্রেটারীর থ্রু দিয়ে। তা হ'লে নিশ্চয়ই খুব ভালো লোক, না রে জয়া?"

"তা আমি কি ক'রে বলব?"

৪

"কি হে, আমাকে স্মরণ হয়েছিল কেন?"

"সন্তোষ নাকি? এসেছ? এস ভাই, এস।" তারপর সহাস্য বদনে বললেন রায়বাহাদুর, "ডাক্তার সাহেবের খবর কি? চলছে আশা করি ভালোই? সহরে তো মরশুম লেগেছে। কলেরা বসন্ত টাইফয়েড—কি বল হে, তোমাদেরই পোয়া বারো। চ'লে যাচ্ছে দিনগুলো তরতরিয়ে, কেমন?"

"মরশুম তো বারো মাসই কলকাতায়, যার চলবার কপাল তার চলে। আর যার তা নয়, তার অচল হয়ে ব'সেই থাকে। যাক এখন ওসব, আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন বল দিকি? আর সব ভালো তো? বৌদি, ছেলে-মেয়েরা?"

"হ্যাঁ সন্তোষ, শারীরিক ভালো আছে সব, তবে—"

"তবে আবার কি ? কি হলো আবার ?"

"ব্যস্ত হ'য়ো না ডাক্তার, বলব ব'লেই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি তো একবার এদিকের পথও মাড়াও না !"

"সে অনুযোগ তুমি করতে পার মনোজ, আমার নাওয়া-খাওয়ারও সময় নেই। এ লাইন যে কি বিশ্রী, আগে জানলে এ পথে আসতাম না।"

"তাই বলছিলাম, দিন চলছে তোমার তরতর ক'রে মরশুমী হাওয়ায়।"

"না ভাই, এ রকম মরশুমি আমি চাই না। তাতে দিন যদি হোঁচট খেতে খেতে যায় তাও ভালো।"

এমন সময় গৃহিণী টেবিলে দু কাপ চা আর দু প্লেট খাবার রেখে বললেন, "ঠাকুরপো, কথা পরে হবে বন্ধুর সঙ্গে, এখন চা খেয়ে নিন। জুড়িয়ে যাবে। আজ রাতে এখানে খেয়ে যাবেন।"

আপত্তির সুরে ডাক্তার বললেন, "না না বৌদি, তা হয় না।"

"কেন হয় না ? খুব হয়। গিন্নী ভাববেন, এই তো আপনার আপত্তির কারণ ? এখুনি ফোন করছি, স্নেহলতাও আসুক, চারটি ডাল-ভাত আমোদ ক'রে খাওয়া যাবে।"

রায়বাহাদুরও আগ্রহভরে বললেন, "সন্তোষ, আপত্তি ক'রো না ভাই। বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই তোমার আর বৌদির সঙ্গে, উনি এলে বড্ড খুসী হব।"

একটু পর গৃহিণী বললেন এসে, "স্নেহকে ফোন ক'রে দিয়েছি, আসছে সে এখুনি।"

রায়বাহাদুর বললেন, "দেখো, আদর-যত্নের ক্রটী না হয়।"

গৃহিণী হাসতে হাসতে বললেন, "ঠাকুরপো কি আমাদের পর যে, ঘটা ক'রে আদর দেখাতে হবে ! যা আমরা খাই, ওঁরাও তাই খাবেন।"

ডাক্তার মৃদু হেসে বললেন, "নিশ্চয়ই, সে কথা আর বলতে।"

এবার সন্তোষ ডাক্তার বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন, "কেন ডেকেছিলে ভাই ? ব্যাপার কি ?"

খালি পেয়ালাটা রেখে রায়বাহাদুর বললেন—"কি যে করি ছেলে-মেয়েকে নিয়ে, বড় বিপদে পড়েছি। সব কটা পড়াশুনো শেষ ক'রে বেকার ব'সে আছে। সারাদিন হৈ-হৈ ক'রে বেড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই তাদের।"

"তুমি এতদিন সুনামের সঙ্গে চাকরী করলে, ঢুকিয়ে দাও না ওদের।"

"কাদের ঢোকাব বল ? দেশ-উদ্ধারের কাজে বড্ড ব্যস্ত এখন।"

ডাক্তার হেসে বললেন, "দেশ তো উদ্ধার হয়েছে।"

"উদ্ধার আর হলো কৈ ? লোকজন খেতে পরতে পায় না, চারদিকে হা-হা ক'রে বেড়াচ্ছে, তাই উঠে-প'ড়ে লেগেছে ছেলেরা, আর তার সঙ্গে মেয়েটাও।"

এমন সময় গৃহিণী এসে বসলেন। রায়বাহাদুর বলতেই লাগলেন, "অনেক কষ্টে অনিলের একটা সরকারী চাকরীর ব্যবস্থা করেছিলাম। পয়লা জয়েনের কথা—এর মধ্যে ব্যাটা সরকারের বিরুদ্ধে এমন গরম গরম বক্তৃতা ঝাড়লে যে চাকরীর দফা রফা। যাকগে ছেলেদের কথা, কোন আশা ভরসা রাখি না আর ওদের ওপর, কিন্তু মেয়েটাকে তো 'যাকগে' ব'লে ছেড়ে দেওয়া যায় না!"

দুঃখিত স্বরে ডাক্তারবাবু বললেন, "কেন জয়া-মা এখন কি করছে ? এম. এ. পাস করেছে, এবার দেখে শুনে ভালো দেখে বিয়ে দিয়ে দাও।"

"তাই তো আমি চাই ডাক্তার, কিন্তু তার বিয়ে দাওয়া মুস্কিল।"

"কিসের মুস্কিল ? রূপে, গুণে, বিদ্যায় অমন মেয়ে কটা পাওয়া যায় ? তুমি ভালো দেখে একটা ছেলে খোঁজ কর।"

"বিয়েতে জয়ার মত নেই ভাই। ওর মাকে দিয়ে বলিয়েছিলাম, তার কোনও জবাবই দিলে না।"

সন্তোষ ডাক্তার একটু চিন্তা ক'রে বললেন, "এক কাজ কর মনোজ। জয়া কার সঙ্গে মেশে, কে কে ওর সহকর্মী—বেশ ভালো ক'রে খোঁজ কর তাদের স্বভাব-চরিত্র, তারপর নিজে জিগ্যেস কর ওকে, কাউকে ওদের মধ্যে পছন্দ কিনা! কি জবাব দেয় দেখ, তারপর পরের কথা ভাবা যাবে।"

গৃহিণী বললেন, "ঠাকুরপো, ওর সঙ্গীদের খোঁজ যদিও আপনার বন্ধু রাখেন না, কিন্তু আমি রাখি। ছেলেগুলি স্বভাবে, চরিত্রে, বিদ্যেয়, বুদ্ধিতে সব হীরের টুকরো। টাকা-পয়সায় সব মধ্যবিত্ত অবস্থা। তবে কুল-শীলের দিক থেকে সবই সম্ভ্রান্ত।"

ডাক্তার হেসে বললেন বন্ধুকে, "বৌদি ফার্স্ট ক্লাস সার্টিফিকেট দিলেন জয়া-মার বন্ধুদের, তবে আর ভাবনা কিসের? ওদের মধ্যে জয়া যাকে পছন্দ করে, দিয়ে দাও তার সঙ্গে বিয়ে।"

রায়বাহাদুর গম্ভীরস্বরে বললেন, "তোমার বৌদির ঐ রকমই পছন্দ। যত সব বাউণ্ডুলে হতভাগার দল! বাপের হোটেলে খেয়ে পরের মোষ তাড়াচ্ছে। ওদের মধ্যে কেউ উপায় করে? দু-একজন যাও বা করে, তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কর্মী হিসাবে সচল হ'লেও পাত্র হিসাবে ওরা একেবারে অচল।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "তোমার কাছে ওরা অবাঞ্ছনীয় হ'লেও যদি জয়ার কাছে বাঞ্ছনীয় হয়, তখন তুমি কি করবে? মেয়ে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। তার অমতে তো তুমি কিছু করতে পারবে না!"

এমন সময় ডাক্তারবাবুর স্ত্রী স্নেহলতা সেখানে হাজির হলেন। রায়বাহাদুর ও গৃহিণী উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে।

"এস ভাই এস, ব'স এখানে।"—ব'লে গৃহিণী তাঁকে পাশের চেয়ারে বসালেন।

স্নেহলতা বললেন, "হঠাৎ তলব আমার কর্তাটিকে কেন? শুনতে পারি কি?"

রায়বাহাদুর বললেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। অর্ধাঙ্গিণীকে বাদ দিয়ে অর্ধাঙ্গের সঙ্গে কোন কথাই চলতে পারে না। জয়ার বিয়ের কি ব্যবস্থা হতে পারে সেই পরামর্শ করছি সন্তোষের সঙ্গে।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "মনোজের ভীষণ চিন্তা হয়েছে ছেলেমেয়ের জন্যে।"

স্নেহলতা বললেন, "ছেলেদের বিয়ের জন্যেও আপনাদের চিন্তা?"

"না না, সে চিন্তা আমি করি না। তবে স্থিতি হলো না তো কারুর? আপনারা বেশ আছেন—নির্ঝঞ্ঝাটের সংসার। কপোত-কপোতীর মত সুখে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন, কোনও ভাবনা-চিন্তা কিছুই নেই। আর আমার?" ব'লে রায়বাহাদুর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

রায়বাহাদুরের অন্তর্বেদনার গভীরতা বেশ ভালো ক'রেই উপলব্ধি করলেন ডাক্তার-গৃহিণী। সন্তান মনের মত না হ'লে মাতাপিতার যে কি কষ্ট, তা তিনি বেশ ভাল ক'রেই বোঝেন। যদিও তাঁর সন্তান নেই, তবু নারীর সহজজাত বুদ্ধি থেকেই অনুভব করতে পারেন—এর চেয়ে দুঃখ বোধ হয় পৃথিবীতে নেই। ডাক্তারবাবু ব্যাপারটা হাল্কা করবার জন্যেই বললেন, "তুমি ভাই অযথা বড্ড চিন্তা কর। এত সামান্য বিষয়ে তুমি মুষড়ে পড়ছ?"

"আমি জানি সন্তোষ, আমার দুঃখ তুমি বুঝতে পারবে না। পারা তোমার পক্ষে অসম্ভব।"

"আমিও ঠিক ঐ কথাই বলতে পারি মনোজ। আমার একটানা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভাবনা-চিন্তা-প্রতিঘাতশূন্য জীবন যে কি ভয়ঙ্কর তা তুমিও বুঝতে পারবে না। তুমি বলছিলে, কি সুখের সংসার আমার! কিন্তু বল তো ভাই, ফলফুলশূন্য কতকগুলো পাতাবাহারের গাছ থাকলেই কি তাকে বাগান বলা যায়? তেমনি ছেলেমেয়ে না থাকলে সে কি সংসার? আমার মতে সে মরুর সমান।"

"ছেলেমেয়েগুলো মনের মত হওয়া চাই তো?"

"সব সময় নয়। যে ছেলে আত্মসর্বস্ব হবে না, সে ছেলেকে বেশীর ভাগ মা-বাপই পছন্দ করে না। যে হবে উদার পরোপকারী আত্মভোলা, সেও অধিকাংশ মা-বাপের মনের মত হবে না। যে নিজেরটা খুব ভালো ক'রে বুঝবে—সেই হবে মনের মত। অবশ্য এ মত সব জায়গায় খাটে না। কিন্তু অধিকাংশ জায়গাতেই খাটে। তোমার ছেলে-মেয়ের মত উদার পরোপকারী দয়ালু কজন আছে? এমন নিঃস্বার্থপরই বা কজন? বাস্তবিকই তোমার ভাগ্য দেখে আমার হিংসে হয়।"

ডাক্তার-গৃহিণী এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন। এবার স্বামীর কথার প্রতিবাদ করলেন, "সংসারে থাকতে হ'লে সংসারী হওয়া দরকার। সাংসারিক বুদ্ধি থাকা আরও দরকার। তোমার গালভরা কথাগুলো শুনতে ভালো, কিন্তু শুধু ঔদার্য নিয়ে সংসারে থাকা যায় না। সন্ন্যাস নিলেই ভালো হয়। ওসব বড় বড় কথা বাদ দিয়ে কি ক'রে ঘর-সংসারে মন বসে, কি ক'রে জয়ার একটা ভালো বিয়ে হয়, এখন তাই পরামর্শ করা দরকার।"

"সে তো দরকারই, তা কি আমি অস্বীকার করছি? যাক এখন ওসব কথা। মনোজ যে কেন ডেকে পাঠিয়েছে আমায়, তা এখনও জানতে পারলাম না।" ব'লে ডাক্তারবাবু বন্ধুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

রায়বাহাদুর বললেন, "সন্তোষ, জয়াকে আমি কলকাতার বাইরে নিয়ে যেতে চাই। ও সভা সমিতি বস্তি ভোলাতে হবে।"

চিন্তিতভাবে ডাক্তার বললেন, "কি ক'রে ভোলানো সম্ভব? তুমি তো যাদুকর নও যে, যাদুবিদ্যায় ভুলিয়ে দেবে?"

হেসে বললেন রায়বাহাদুর, "বন্ধু, তোমার সাহায্য পেলে আমি ওকে সব ভুলিয়ে দিতে পারি।"

আশ্চর্য হয়ে ডাক্তার বললেন, "বল কি ভাই, তুমি চাও আমার সাহায্য? আমি কি করতে পারি?"

"তুমিই পার, আর কেউ পারে না।"

"হেঁয়ালি রেখে সোজা বল, আমার দ্বারা কি হতে পারে?"

"তুমি রটিয়ে দাও আমার ছেলেমেয়ের কাছে যে, আমার খুব অসুখ হয়েছে। আর সে অসুখটি হবে এমন, যাতে খাওয়াদাওয়ার কোন বাছবিচার করতে হবে না। চেহারার পরিবর্তনের দরকার হবে না। অথচ এমন অসুখ, চেঞ্জে না গেলেও সারবে না। অসুখের প্রধান ওষুধ, মনের শান্তি। সামান্য উত্তেজনাতেই যখন-তখন হয়ে যেতে পারি। এবার বুঝলে তো?"

"বুঝেছি বন্ধু, পাকা ঝানু হাকিমী মাথা তোমার, শুধু শুধু কি 'রায়বাহাদুর' খেতাবটা পেয়েছ? কিন্তু কি অসুখটা তোমার করবে বল তো?"

"সে কথাটাও বুঝি আমায় ব'লে দিতে হবে?"

"তোমার চেঞ্জ, শান্তি আর ভালো খাওয়া চাই—এই তো?"

"হ্যাঁ ভাই।"

একটু চিন্তা ক'রে ডাক্তার বললেন, "ধর, যদি বলি—লো ব্লাডপ্রেসার, তবে কেমন হয়?"

রায়বাহাদুর একটু ভেবে বললেন, "হার্ট ডিজিজ্ হ'লেই বা কেমন হয়?"

"লো ব্লাডপ্রেসার থেকেই আসে হার্ট ডিজিজ, আর এ অসুখে খাওয়া-দাওয়া চেঞ্জ মনের শান্তি সব দরকার।"

"বেশ বেশ, যা ভালো বোঝ তাই কর।"

ডাক্তার-গৃহিণী বললেন, "অসুখটা কি আজ থেকেই আরম্ভ হবে নাকি?"

"না না, আজ থেকে নয়। কাল পরশু থেকে সূত্রপাত, পাঁচ-ছ দিন পর আমি সন্তোষকে কল দেব।"

"আপনি সব ভেবে চিন্তেই রেখেছেন আগে থেকেই দেখি!"

এমন সময় ঠাকুর জানালে, খাবার প্রস্তুত। গৃহিণী বললেন, "এস ভাই স্নেহ, আসুন ঠাকুরপো, রাত হয়েছে—খাবেন আসুন।"

৫

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত হয়ে গেল অনেক। বন্ধু বন্ধুপত্নীকে বিদায় দিয়ে কর্তা গৃহিণী যখন শুতে এলেন, তখন বারোটা বেজে গেছে। বৈশাখের অসহ্য গরম, বৃষ্টি হচ্ছে না কয়েকদিন ধ'রে। বাতাসও গরম হয়ে উঠেছে। যদিও মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে অন পয়েণ্টে বোঁ-বোঁ ক'রে, তবুও মনে হচ্ছে শরীর যেন জ্ব'লে পুড়ে যাচ্ছে। গৃহিণী থাকতে পারলেন না ঘরের ভিতর, দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

অমাবস্যার রাত্রি, কে যেন কালো রঙের যবনিকা টেনে দিয়েছে ধরণীর উপর। কিছু দেখা যায় না। কেবল রাস্তার গ্যাসগুলি মিটমিট করছে, যেন সারি সারি কে প্রদীপ জ্বেলে রেখেছে! আর মাথার উপর দিগন্তপ্রসারিত কালো আকাশে ঝিলমিলে নক্ষত্রগুলি এক অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। কে বলে, অন্ধকারের রূপ নেই? অপূর্ব সুন্দর প্রাণ জুড়ানো রূপ। এতে মাদকতা নেই, আছে স্নিগ্ধতা; বিভ্রমের সৃষ্টি করে না, কিন্তু মুগ্ধ করে চেতনাকে। সমস্ত সত্তা ডুবিয়ে দেয় সেই চিরসুন্দরের অনির্বচনীয় রূপ-সাগরে। গৃহিণীর সমস্ত মনপ্রাণ এক অভূতপূর্ব শান্তির কোলে ডুবে গেল। চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে রইলেন তিনি বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু এ ভাব তাঁর রইল না বেশীক্ষণ, মন তাঁর কঠিন, নির্মম ধূলি-ধূসর মাটির পৃথিবীতে চিন্তার পর চিন্তার ঢেউ খেলতে লাগল মনের ভিতর।

অদ্ভুত এই মানুষের মন, সে যে কখন কি চায় নিজেই বুঝতে পারে না। কি পেলে যে শান্তি পাবে তাও জানে না। উমাসুন্দরী মনে করতেন, তাঁর ছেলে মেয়ে লেখা-পড়া শিখে যদি নিজের জীবন দেশের জন্যে উৎসর্গ করে, তবে তিনি খুব সুখী হবেন। উদার পরোপকারী স্বার্থত্যাগী সুসন্তানের মাতা তিনি—এ চিন্তাতেই গর্বে মন প্রাণ ভ'রে উঠত; অথচ মজার কথা এই যে, যথার্থই যখন তাঁর কল্পনা বাস্তবে পরিণত হ'তে চলল, তাঁর মন তখন বলতে আরম্ভ করল, না না, এ আমি ভুল চেয়েছিলাম। ওরা আর পাঁচজনের মত সুখে শান্তিতে ঘর-কন্না করুক, সুখের নীড় বাঁধুক। মনের মত উপযুক্ত সঙ্গী জন্মা খুঁজে নিক, আর মনের মত সঙ্গিনী নিক ছেলেরা। নাতি-নাতনীতে ঘর উঠুক ভ'রে, তাদের চাঁদবদন দেখে তাঁর জীবন সার্থক হোক। প্রায় প্রতিটি নারীরই তো এই শাশ্বত কামনা, কিন্তু কামনা করলেই কি সফল হয়? তিনি গ'ড়ে তুলেছেন ছেলে-মেয়েকে ঠিক এর বিপরীত ভাবে। এখন তাঁর ইচ্ছে বদলালেও ছেলেদের তো বদলায় নি, কাজেই আশা পূরণ হাওয়া সুদূরপরাহত। নানা রকম আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে বারান্দার ঘুমিয়ে পড়লেন গৃহিণী।

ভোরের পাখীর কূজনে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ভোরের ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাসে মনটাও অনেকটা শান্ত হয়ে এল। গত সন্ধ্যায় ডাক্তারের সঙ্গে কর্তার পরামর্শের কথাগুলো মনে প'ড়ে গেল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, বাস্তবিকই জয়াকে এখান থেকে সরানো দরকার। আর ছেলে দুটোকে যে কোন মাইনেতেই হোক চাকরীতে ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার। কাজের চাপে হৈ-চৈ করা ক'মে আসবে।

সকালে চায়ের পর সেদিন হঠাৎ রায়বাহাদুর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অনিল ফোনে ডাক্তার-কাকাকে কল দিল। একটু পরেই সন্তোষ ডাক্তার গম্ভীর মুখে উপস্থিত হলেন। সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন গৃহিণী, ডাক্তার একটিও কথা বললেন না তাঁর সঙ্গে। রায়বাহাদুরের বুক নাড়ি জিভ পরীক্ষা ক'রে বললেন, "ভারি উইক হার্ট। খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে। মন বেশ ঠাণ্ডা রাখতে হবে।" ব'লেই খস্ খস্ ক'রে প্রেসকৃপশন লিখে দিলেন। বন্ধুর সঙ্গে কোন হাসি-ইয়ার্কি করলেন না। গম্ভীরভাবে শরীর সম্বন্ধে কতকগুলো উপদেশ দিয়ে বললেন, "তোমার যে বয়েস তাতে ওষুধে বিশেষ কিছু কাজ করবে না। ধীর স্থির শান্তভাবে থেকো। কোন বিষয়ে উত্তেজিত হ'য়ো না। মনকে ঠাণ্ডা রেখো।"

সন্তোষ ডাক্তার চ'লে গেলেন। ছেলে-মেয়েরা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল।

গৃহিণী বললেন, "শুনলে তো তোমাদের ডাক্তার-কাকার কথা। এখন একটু ধীর স্থির হয়ে বাড়ীতে থেকো। সামান্য উত্তেজনাতেই আবার অসুখ বেড়ে যাবে।

কয়েকদিন ভয়ে ভয়ে তারা বাড়ীতেই রইল। অনিল সুশীল সকালের দিকটা একটু বেরোয় চাকরীর খোঁজে, কিন্তু বিকেলের দিকে ঘরেই ব'সে থাকে। আর জয়া রায়বাহাদুরের কাছেই ব'সে থাকে দিনরাত। সকালের দিকে কাগজ প'ড়ে শোনায়, বিকেলে নভেল আর সন্ধ্যেতে করে গল্প। সব সময় পিতাকে প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করে। রায়বাহাদুরের মনে মনে খুসী হয়ে

ওঠেন। ভাবেন, ওষুধ ধরেছে। যত খুসী হন ভেতরে, তত নেতিয়ে পড়েন বাইরে। বলেন মাঝে মাঝে, "জয়া মা, বুকটায় হাত বুলিয়ে দাও তো। বড় কষ্ট নিশ্বাসের।"

জয়া ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে, "বাবা, ডাকি সন্তোষ-কাকাকে ?"

মৃদুস্বরে বলেন রায়বাহাদুর, "থাক্ মা থাক্, এমন বেশী কিছু নয়।"

কিন্তু জয়া তা শোনে না, ফোনে ডাক্তার-কাকাকে ডাকে। ডাক্তার এসে আবার আগাগোড়া পরীক্ষা করলেন বন্ধুকে। তারপর ম্লান মুখে বললেন, "মনোজ, তোমার চেঞ্জের দরকার।" কথাটা শেষ ক'রে একবার আড়চোখে দেখেন জয়াকে। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তার চোখ মুখ ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। সন্তোষ ডাক্তার তখন বলেন, "জয়া মা, মনোজকে এক কাপ ওভালটিন, আর যদি কষ্ট না হয় আমাকে এক কাপ আদার রস দিয়ে চা। বড্ড গা হাত পা ব্যথা করছে কাল থেকে।"

জয়া ভারাক্রান্ত মনে চ'লে গেল। ডাক্তার এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, "ফার্স্ট ক্লাস দাওয়াই হয়েছে বন্ধু।"

মনোজবাবু ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন, "বাহাদুরিটা তোমার চেয়ে আমারই প্রাপ্য বেশী। কৌশলটা আমিই বের করেছি মাথা থেকে।"

"তা আমি হাজারবার স্বীকার করছি। শুধু কৌশল কেন! চমৎকার অ্যাকটিংও করছ।"

"কিন্তু এ রকম বেশী দিন চলবে না ভাই। হরদম ওর সমিতি থেকে ফোন আসছে। তাছাড়া আজ দুপুরে কতকগুলি মেয়েও এসেছিল।"

"ছেলেরা কি করে এখন ?"

"তারাও অনেকটা ভয় পেয়ে গেছে। নাওয়া-খাওয়া ঠিকমত করে এখন। চাকরীও খুঁজছে। শুধু শুধু টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়ায় না। কিন্তু এভাবে বেশীদিন থাকলে চলবে না। এখান থেকে জয়াকে নিয়ে চ'লে যেতে পারলেই ভালো হোত।"

"যাও চ'লে।"

"এত গরমে কোথায় যাব ?"

"পুরীতে যাও। সমুদ্র আর জগন্নাথদেবের মন্দির দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে। যেমনি সমুদ্রের বিরাট রূপ, তেমনি বিরাট রূপ জগন্নাথ-দেবেরও।"

"না ভাই, পুরী আমার বেশী ভালো লাগবে না।"

এমন সময় জয়া ওভালটিন আর বেয়ারা চা ও এক প্লেট খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। ডাক্তারবাবু বললেন, "এ কি মা জয়া, শরীর আমার ভালো নয়, এত খাবার আনলে ?"

"সামান্য কাকাবাবু। যত শরীরই খারাপ হোক, একটুকু খেতে পারবেন।"

"বৌদি কোথায় ? তাঁকে দেখছি না কেন ?"

"মা আমাদের কিছু কাপড় কিনতে বাজারে গেছেন। এখুনি এসে পড়বেন।"

"শোন মা জয়ারাণী, মনোজের চেঞ্জ দরকার। সেই কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। কোথায় যাওয়া ভালো বল তো ?"

"বাঃ রে, আপনি কাকাবাবু ডাক্তার, আপনিই বলুন—কোথায় যাবেন বাবা !"

এমন সময় রায়বাহাদুর বললেন, "আমার ইচ্ছে রাজগীরে যাই সামনের পুজোতে। সেখানে স্বাস্থ্য আর দৃশ্য দুইই ভালো। আমার মেজো শালীর একটা বাড়ীও আছে সেখানে।"

জয়া বললে, "পুজো তো অনেক দেরী বাবা।"

"এ গরমে কোথাও যাব না মা।"

"কাকাবাবু, ওষুধ দিয়ে এ ক'মাস চাঙ্গা ক'রে রাখুন।"

সন্তোষ ডাক্তার হেসে বললেন, "ওষুধের চেয়ে সেবারই বেশী দরকার। তুমি লক্ষ্মী হয়ে সব সময় মনোজের কাছে কাছে থেকো আর সেবাযত্ন ক'রো। তা হ'লেই চাঙ্গা থাকবে।"

রায়বাহাদুর বললেন, “মায়ের সেবার গুণেই বেঁচে আছি ভাই।”

সন্তোষ ডাক্তার বললেন, “ঐ শুনলে তো কি বললে মনোজ!”

জয়া লজ্জিত স্বরে বললে, “বাবার বাড়াবাড়ি কাকাবাবু। কি আর এমন করছি!”

“যা করছ তাই যথেষ্ট। ঐটুকু বজায় রেখো।” ব'লে সন্তোষ-ডাক্তার বন্ধুর দিকে চাইলেন।

৬

রায়বাহাদুরের অসুখের পর জয়ার বাইরে যাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। দিবারাত্র পিতার কাছে থাকতে থাকতে সময় সময় শরীর ও মন তার অবসাদে ভ'রে ওঠে, কিন্তু পিতার অসুখের কথা চিন্তা ক'রে সেই মুহূর্তেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। স্বার্থপর মনকে চোখ রাঙায়। মনের যখন এই অবস্থা, এমন সময় সমিতির মেয়েরা এল শান্তি-আন্দোলন নিয়ে। জয়াও ইত্যবসরে ঠিক ক'রে রেখেছিল, পিতার সেবার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ীতে থেকেই যতটা পারা যায় সমিতির কাজ সে করবে। মায়ের অনুমতি নিয়ে বাড়ীতেই মিটিং ডাকতে সমিতির মেয়েদের সে ব'লে দিলে।

সেদিন দ্বিপ্রহরে মা মেয়ে জানলার ধারে ব'সে মিটিংএর কথাই আলোচনা করছিল। হঠাৎ জয়া রাস্তার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে গেল। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন। সূর্যদেব প্রচণ্ড তেজে কিরণ বর্ষণ করছেন ধরণীর উপর। বাতাসে আগুনের স্রোত বইছে। রাস্তা প্রায় জনশূন্য। চারদিক খাঁ-খাঁ করছে। কেবল দু-একটি রিক্সা ছুটছে টুং-টুং করে। আর চলছে ঘর্মাক্ত কলেবরে চীৎকার করতে করতে কয়েকটি ফেরিওয়ালা। কেন চলছে তারা এই নিদাঘ-তপ্ত দ্বিপ্রহরে? মাথার উপর জ্বলছে প্রদীপ্ত সূর্য, পায়ের নীচে উত্তপ্ত ধরণী। তাতে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের, হেঁকেই চলেছে তারা আপন মনে। তারা কি জানে না, হর্ম্যবাসিনীরা এখন খস্‌খসের পর্দার অন্তরালে, পাখার তলায়

নিদ্রাভিভূতা কিংবা নাটক নভেল অথবা রেডিও গানে মগ্ন! জানে বৈ কি,—জানে ব'লেই হাঁকতে হাঁকতে তারা চেয়ে থাকে উর্দ্ধ পানে জানলার দিকে। যদি কারুর দরকার হয়, ডাকে তাদের ইসারায়। দুঃখে কষ্টে অভিশপ্ত জীবন তাদের, ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি—সব কিছু উপেক্ষা ক'রেই টানতে হবে জীবনের বোঝা, বেচারীদের প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত। জয়া রাস্তার দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে বলছিল 'আহা রে!' দরদী প্রাণ তার হাহাকার ক'রে ওঠে ঐ হতভাগ্য জীবগুলোর জন্যে। করুণ মুখে মাকে বললে, "মা, দেখ ওদের কি কষ্ট! এত রোদে চলছে ওরা দুটো পয়সার জন্যে।" মা বোঝেন, মেয়েকে বলেন সান্ত্বনার স্বরে, "কি করবে মা তুমি? এ সংসারে এই তো নিয়ম। কেউ গদিতে থাকে ব'সে আর কারুর হাড় ভেঙে যায় খাটতে খাটতে। কেউ অপর্যাপ্ত খেয়ে অম্বলের জ্বালায় অস্থির হয়, আর কেউ আবার না খেয়ে মরে।"

"এ অন্যায়ের কি প্রতিকার নেই মা?"

"আছে জয়া, কিন্তু সে একদিনে হবে না। দেশের রীতিনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে দৃঢ়চিত্তে। জীবনের মায়া ছেড়ে নিজেদের আহুতি দিতে হবে।"

এতক্ষণে জয়া যেন একটা পথ পেল। বললে আগ্রহ ভরে, "তাই আমি দেব মা, কেবল তুমি পথ দেখাও।" মেয়ের কথায় চমকে উঠলেন গৃহিণী। এতদিন এই পথ দেখিয়েই তো এই বিপত্তি। বললেন, "না মা, তা আর হয় না। তুমি আমি একা কি করতে পারি? পদে পদে বাধা, কিছু করতে গেলেই তোমার বাবার অসুখ যাবে বেড়ে। সব চেয়ে কর্তব্য তোমার সামনে। এখন একটু চুপচাপ থাকতেই হবে। তা ছাড়া ইচ্ছে থাকলেই পথ হয়। যদি তুমি একটা অভাগারও জীবন ফিরিয়ে দিতে পার—এর চেয়ে বড় কাজ নেই। নিজের সঙ্কল্প দৃঢ় কর, একদিন না একদিন ইচ্ছে পূরণ হবেই। আমার পূর্ণ সহানুভূতি আর আশীর্বাদ তোমার ওপর রইল।"

কর্তা ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে ছিলেন অদূরে খাটের উপর। সব কথাই কান খাড়া ক'রে শুনলেন তিনি। রেগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন গৃহিণীর উপর। কিন্তু এত বড় মেয়ের সামনে রাগ করা উচিত নয় ভেবে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে প'ড়ে রইলেন, কিছুক্ষণ কান পেতে থাকবার পর মা বা মেয়ের কোন কথাই আর কানে এল না। ভাবলেন রায়বাহাদুর, দুজনেই হয়তো উঠে গেছে ঘর থেকে। চোখ মিট্‌মিট্‌ ক'রে দেখলেন, ঘরেই রয়েছে দুজনে উদাসদৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে। ক্ষীণ কণ্ঠে চিঁ-চিঁ স্বরে বললেন গৃহস্বামী, "মা জয়া, একটু বেদানার রস ক'রে দাও তো।"

"দিচ্ছি বাবা।"—ব'লে জয়া চ'লে গেল।

মেয়ে বের হওয়া মাত্র রোগীর চিঁ-চিঁ স্বর বজ্রগভীর হয়ে উঠল। মুদিত নয়ন রক্তবর্ণ ধারণ করল। রুক্ষ কণ্ঠে ব'লে উঠলেন তিনি, "কি বলছিলে জয়াকে এতক্ষণ ?"

"যা বলেছি সব তো শুনেছ।"

"আবার নাচাচ্ছিলে মেয়েকে ?"

এবার গৃহিণী রেগে উঠলেন। বললেন, "কি অন্যায় বলেছি আমি ? বললামই তো যে, তোমার বাবার অসুখ, এখন কিছু করা যাবে না।"

"এ কথার মানে—এখন হবে না, তবে বাপ মরলে আবার ঘুরো রাস্তায় রাস্তায়, এই তো ?"

"যার যেমন মন সে তেমন অর্থ করে কথার। আর গরীব-দুঃখীকে যদি দয়াই করে একটু, তাতে তোমার আপত্তি কেন ?"

"দয়া করা এক কথা, আর ওদের জন্যে উতলা হওয়া আর এক কথা,. তোমার জন্যে ও চিরদিন মনে শান্তি পাবে না।"

"আমার জন্যে ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমারই জন্যে। যার ঘর করবে তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। যেমন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছ তুমি আমাকে।"

"তোমার মত স্বভাব যদি হয় তবে জ্ব'লে পুড়ে মরবেই সে।" ব'লে গৃহিণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এপাশে অসুস্থতার ভান, বেশী চেঁচাতেও পারেন না, কাজেই শুয়ে শুয়েই মনে মনে গজরাতে লাগলেন তিনি। একবার ভাবলেন, মেয়েটাকে মায়ের আওতা থেকে সরাতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। কিন্তু কি ক'রে সরাবেন তিনি? কি করবেন রায়বাহাদুর এই হাড়-জ্বালানো স্ত্রীকে নিয়ে? সারাজীবন তো সেই চিন্তাতেই কেটে গেল। কিছুই তো করতে পারলেন না। এ স্ত্রী নিয়ে তাঁর সারা জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল, এখন ছেলে-মেয়েরও জীবন যাবে ব্যর্থ হয়ে। হা ভগবান! একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাঁর বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

জয়া এক কাপ বেদানার রস নিয়ে বাপের কাছে বসল। রায়বাহাদুর মেয়েকে দেখে উঠে বসলেন, "দাও মা, আমার হাতে।"

"শোও না বাবা, দিচ্ছি আমি খাইয়ে।"

"না মা, আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় না। অনেকক্ষণ শুয়ে আছি।" রায়বাহাদুর কাপের রসটুকু নিঃশেষ ক'রে খেয়ে কাপটা জয়ার হাতে দিলেন। তারপর মুখ মুছে বললেন, "সন্তোষ বলছিল পুরী যেতে, কি করা যায় বল্ দিকি?"

"বেশ তো বাবা, যদি তুমি ভালো থাক, চল পুরীতে।"

"ভালো থাকা কি দেশ বদলালেই হয় মা! তোরা ভালো থাকলে, ভালো ভাবে চললে এ কলকাতাতেই ভালো থাকব।"

"তোমার শুধু শুধু ভাবনা। বড়দা ছোটদা তো উঠে-প'ড়ে লেগেছে চাকরীর জন্যে। আর আমি তো দিনরাত কুড়ে হয়ে ব'সেই আছি।"

"কুড়ে হয়ে ব'সে আছ কখন? আমার সব কাজ তো তোমার ওপরই, সব খুঁটিনাটি কাজই তো তুমি কর। বাপের সেবা করাকে কি তোরা কুড়ের কাজ বলিস?"

"না বাবা, তা বলি না, তবে ঘর-বার দুই-ই করা দরকার। আজকাল সে যুগ নেই যে, সব সময় ঘরের চিন্তাটুকুই করব আর ভাবব না বাইরের কথা।"

রায়বাহাদুর দেখলেন, কথার মোড় বেঁকে যাচ্ছে। তাই বললেন, "ঠিকই তো মা, ঘর-বার দুই-ই করতে হবে বৈ কি। কোনটাই বাদ দেওয়া যায় না।"

জয়া কি যেন একটু চিন্তা ক'রে কুণ্ঠিতভাবে বললে, "বাবা, একটি কথা আমার রাখবে, বল তুমি?"

"সামর্থ্যে যদি কুলোয় মা, নিশ্চয়ই রাখব।"

"সামর্থ্য আছে বাবা তোমার, তাই বলছি। সামনের বস্তিতে একটা টিউবওয়েল ক'রে দাও বাবা, লক্ষ্মীটি। বড্ড জলকষ্ট ওদের। জলের জন্যে রাস্তার কলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কি যে কষ্ট ওদের!"

"একটা টিউবওয়েল দিলেই কি ওদের কষ্ট কমবে মা? অতগুলি লোক?"

"কিছু কমবে বাবা। বস্তির ঠিক মাঝখানে বেশ ভালো ক'রে বাঁধিয়ে একটা মজবুত ক'রে টিউবওয়েল ক'রে দাও। দেবে তো বাবা?"

কি বলবেন তিনি মেয়ের মুখের উপর? যদি বলেন—এখন অনেক খরচ, তবে মেয়ে নিশ্চয়ই বলবে—তার গয়না ভেঙে যেন করা হয়। ঝোঁক যখন উঠেছে, ক'রে দিতেই হবে। কিছুতেই ছাড়বে না। এসব যুক্তি ওর মা দিয়েছে। জানে, মুখের ওপর কিছু বলতে পারব না।

"বাবা চুপ ক'রে রইলে যে, দেবে না?"

"তুমি যখন ধরেছ জয়ারাণী, দিতেই হবে।"

"তবে দেবে বাবা?"

"হ্যাঁ রে পাগলী দেব।"

আনন্দে দিশেহারা হয়ে ছুটল জয়া মাকে সুখবরটা দিতে। এত বড় সুখবর মাকে না দিয়ে কি থাকা যায়? তার মায়ের মত অমন বিরাট মন কার আছে? মেয়ে তো ছুটল মায়ের কাছে আনন্দের আতিশয্যে; কিন্তু রায়বাহাদুর এপাশে ফুলতে লাগলেন গৃহিণীর উপর। একটি পয়সা কেউ

আনে না, সব দায় সামলাতে হয় তাঁকেই। চেঞ্জে যেতে কত খরচ! তার উপর দয়াদাক্ষিণ্য—উপায় করতে হয় না তো নিজেকে, চিরকাল হুকুম চালিয়েই এসেছে, কত কষ্টের টাকা বুঝবে কি ক'রে! যদি বুঝতে পারত, ঘরের খেয়ে এমন ক'রে পরের মোষ তাড়াত না।

৭

নাচতে নাচতে এসে জয়া বললে, "মা, বাবা বলেছেন টিউবওয়েল ক'রে দেবেন বস্তিতে।"

ঝি তখন বাসন মাজছিল কলতলায়। কথাটা কানে যেতেই ব'লে উঠল, "কোন্ বস্তিতে গো দিদিমণি, কোন্ বস্তিতে গো বাবু টিপকল ক'রে দেবেন?"

"তোমাদের বস্তিতে গো, তোমাদের বস্তিতে।"

"ওমা, তাই নাকি? বেঁচে থাক দিদিমণি, বেঁচে থাক তুমি। ভালো বিয়ে হোক। আমাদের রাজা জামাইবাবুর কাছে কত জিনিস পাব।"

"ঐ তো দোষ তোদের, আনন্দ হ'লেই বিয়ের আশীর্বাদ ক'রে বসবি! যেন বিয়ে ছাড়া আর আমাদের গতি নেই। খবরদার, আর যদি বিয়ের কথা বলবি তবে তোদের টিপকল ক'রে দেব না।"

অবাক হয়ে ঝি খানিকটা চেয়ে রইল জয়ার মুখের দিকে, দিদি বিয়ের কথায় রেগে ওঠে কেন? এ 'কেন'র উত্তর বেচারী কিছুতেই খুঁজে পায় না।

জয়া মাকে বললে, "মা, বাবার অসুখ, বেরোতে পারি না, কিন্তু সমিতির সেক্রেটারী আমি, মিটিংএ তো থাকা দরকার। তাই মেয়েদের ব'লে দিয়েছি বাড়ীতেই মিটিং ডাকতে।"

"কবে হবে মিটিং?"

"কাল বিকেল চারটেয় নীচের ঘরে হবে, কি বল? গোলমাল হবে না। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।"

"বেশ তো।"

পরদিন বেলা চারটে। নীচে বসেছে মিটিং আর ওপরে হচ্ছে তুমুল ঝগড়া—জয়ার মার সঙ্গে বাবার। রায়বাহাদুর বলছেন রুষ্ট হয়ে, "ঘরে মিটিং করতে মত দিয়েছে কে, তুমি নিশ্চয়ই? বস্তিতে টিউবওয়েলের কথা কে মাথায় ঢুকিয়েছে জয়ার, তুমি নিশ্চয়ই?"

গৃহিণী দৃঢ় স্বরে বললেন, "হ্যাঁ, আমিই। তাতে অন্যায় কি হয়েছে শুনি? বাড়ীতে ব'সে যদি মিটিং করে কিংবা গরীবদের জন্যে যদি একটা টিউবওয়েলের বায়না ধরে, তাতে কি অন্যায় হয়?"

"কি অন্যায় হয় তা বোঝবার শক্তি তোমার নেই। আর টাকা আসবে কোথা থেকে? নাচিয়ে দিলেই তো আর হয় না।"

গৃহিণী ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "একটা টিউবওয়েল করলেই তুমি ফেল্ পড়বে না, কি হবে ব্যাঙ্কের এত টাকা নিয়ে? টাকা তো আর সঙ্গে যাবে না!"

"টাকার মর্যাদা তুমি বুঝবে কোত্থেকে?"

স্বামীর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে গৃহিণীর একটুও দেরী হলো না। পিতা ছিলেন উপার্জনবিমুখ বিপ্লবী। টাকা ছিল না বাপের, কাজেই টাকার কথা বুঝবে কি ক'রে সেই বাপের মেয়ে! এইটিই ইঙ্গিতে বললেন রায়বাহাদুর স্ত্রীকে। গৃহিণী বক্র হেসে জবাব দিলেন, "বাবা আমার গরীব, টাকার দাম বুঝতেন না—এজন্য আমি গর্বিত। জন্মে জন্মে যেন ঐ বাপই পাই আমি। আর কপালের ফেরে যদি জন্মান্তরে আবার দেখা হয় তোমার সঙ্গে, দয়া ক'রে মনটা একটু বদলে এসো।" কথা কয়টি ব'লেই গৃহিণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রায়বাহাদুর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে।

শেফালি বললে, "জয়াদি, কটা সই যোগাড় করেছি বটে, কিন্তু সহজে কেউ দিতে চায় না। কেউ কেউ স্পষ্টই বলে—এ কমিউনিস্টদের আর একরকম ফাঁদ, এতে সই আমরা দেব না।"

জয়া আশ্চর্য হয়ে বললে, "কমিউনিস্টদের ফাঁদ মানে কি? তাঁরা শান্তি চান না? যুদ্ধ চান?"

"তা কেউ কেউ বলেন—'শান্তি 'শান্তি' ব'লে চেঁচালেই তো হবে না। দেশের গলদ থাকলে যুদ্ধ আসবেই। আমরা চাই—যুদ্ধ এসে আমাদের ধ্বংস ক'রে দিয়ে যাক, আর সহ্য হয় না এত কষ্ট।"

"অতএব আমরা সই দেব না—এই তো? কি অদ্ভুত যুক্তি!" জয়া আপন মনেই হেসে উঠল।

"তারপর শুক্তি, তুমি শান্তি-কুপন কটা বিক্রী করেছ ভাই?"

"মাত্র কুড়িটি জয়াদি। সবাই নিতে চায় না। দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে বেপরোয়া হয়ে গেছে সব। কুচবিহারের ওপরেও আমাদের একটা প্রস্তাব আনতে হবে।"

এমন সময় একটি সুদর্শন যুবক উঁকি দিয়ে বললে, "আসতে পারি?"

"আসুন।" ব'লে জয়া যুবকটির দিকে তাকাল, তারপর মেয়েদের বললে, "ইনি হচ্ছেন সেবক-সমিতির সেক্রেটারী, নাম—কল্যাণ রায়।" তারপর কল্যাণকে বললে, "এঁরা আমার বন্ধু ও সহকর্মিণী।"

পরস্পরে নমস্কার বিনিময় হলো।

জয়া বললে, "কল্যাণ, খবর কি? ব'স ভাই, দাদাদের ঘরে।"

কল্যাণ ইতস্তত ক'রে বললে, "জয়াদি, বসবার আমার সময় নেই। একটা জরুরি কাজে এসেছিলাম, তোমার সময় নষ্ট করব না। মাত্র পাঁচ মিনিট।"

জয়া প্রেসিডেণ্টের অনুমতি নিয়ে কল্যাণের সঙ্গে পাশের ঘরে গেল। কল্যাণ বললে, "আমাদের একটি কর্মীর টি.বি. ব'লে ডাক্তার সন্দেহ করছেন, যাদবপুরে সিট্ পাওয়া গেল না, অনেক কষ্টে কাশিয়াংঙে সিট্ পাওয়া গেছে। এখন টাকা যোগাড় করতে পারছি না যে ভর্তি ক'রে দিই। আমার আংটি আর বোতাম বিক্রি ক'রে সামান্য যা পেয়েছি তাতে ভর্তি হওয়া চলবে না। তা ছাড়া জান তো এসব রোগের রাজসিক চিকিৎসা, সামান্য টাকায় কিছুই হবে না। অন্তত দু-তিন মাসের খরচ জোগাতে পারলে লেখালেখি ক'রে হয়তো ফ্রি বেডের ব্যবস্থা করতে পারব। কিন্তু এ দু-তিন মাসই বা চালাই কি ক'রে?"

চিন্তিতভাবে জয়া বললে, "আমার কাছেও তো টাকা নেই কল্যাণ। তবে যাই মায়ের কাছে, হয়তো একটা কিছু উপায় হতে পারে। তুমি এখানে ব'স।"

গৃহিণী তখন স্বামীর জন্যে ওভালটীন তৈরী করছিলেন। জয়ার কাছে সব শুনে তিনি একটু নীরব থেকে বললেন, "কল্যাণকে একটু অপেক্ষা করতে বল্, আমি চেক্‌টা বের ক'রে লিখে দিচ্ছি।"

জয়া জানে তার মাকে, তবু অধীর হয়ে ব'লে উঠল, "মা গো, দেবে তুমি টাকা?"

গৃহিণী হেসে বললেন, "কেন রে বেইমান্, তোর কোন্ কাজে টাকা দিই না?

"তা তো দাও মা, আর তুমি না দিলে দেবেই বা কে? দাও মা, বাবাকে আমি ওভালটিন খাইয়ে আসি। ততক্ষণ তুমি চেক্‌টা লেখ।" ওভালটিনের কাপটা মায়ের হাত থেকে নিয়ে চ'লে গেল জয়া।

"বাবা, ওভালটিন এনেছি খেয়ে নাও।" ব'লে পিতার সামনে কাপটা রাখল।

"কে রে? জয়া? তোর মিটিং হয়ে গেল?"

"না বাবা, মিটিং হয় নি এখনও। মেয়েদের বসিয়ে রেখে এসেছি।"

"আমাকে ওভালটিন খাওয়াতে মিটিং ছেড়ে এলি কেন? বাড়ীতে কি আর কেউ নেই?"

জয়া একবার ভাবলে, হ্যাঁ ব'লে দেওয়াই ভালো। কিন্তু খুসীতে ওর মন তখন ঝলমল করছে, মিথ্যের কালিমায় তাকে নষ্ট করতে ইচ্ছে হলো না। কাজেই কথাটার সোজা উত্তর না দিয়ে সে বললে, "একটু কাজ ছিল বাবা, তাই এসেছিলাম। ওভালটিন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, খেয়ে নাও তুমি।"

"এমন কি তোর কাজ ছিল যে মিটিং ছেড়ে আসতে হলো, শুনতে পারি কি?"

জয়া মুস্কিলে পড়ল একটু ; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, "বাবা, একটি কর্মীর সাসপেক্‌টেড্ টি. বি. হয়েছে, কিছু টাকার দরকার, মা দিতে পারবে কি না জানতে এসেছিলাম।"

মা কি বললেন—এ কথাটা আর জানবার প্রবৃত্তি হলো না তাঁর মেয়ের কাছ থেকে। 'হুঁ' ব'লে এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেললেন ওভালটিন।

"বাবা, আমি যাই ?"

"যাও।"

রায়বাহাদুরের মুখ দেখে বুঝতে পারলে জয়া, আজ একটা খণ্ড প্রলয় হবে তার মার সঙ্গে। মায়ের কাছে গিয়ে বললে, "মা, চেক লেখা হয়েছে ?"

"হয়েছে। এই নে।" ব'লে তিনি মেয়ের হাতে চেক দিলেন।

চেকের দিকে চেয়ে জয়া লাফিয়ে উঠে বললে, "মা, পাঁচ শ টাকা দিলে ? বাবা যে রাগ করবেন।"

"একটা টি. বি. রুগীর পক্ষে পাঁচ শ টাকা এমন কি বেশী ? ওঁর রাগ সব সময় আছেই। আমার নিজের টাকা থেকেই দিয়েছি। তোর ওসব ভাবতে হবে না। তুই বরং কল্যাণকে ডেকে আন্ এখানে।"

"তাই ভালো।" ব'লে জয়া কল্যাণকে ডাকতে ছুটে গেল।

চেক হাতে নিয়ে কল্যাণ গৃহিণীকে প্রণাম ক'রে বললে, "মাসীমা, আপনার মত মন যদি বাংলাদেশের সব মায়ের হতো, তাহ'লে ভাবনা ছিল না।"

"কি আর দিতে পেরেছি বাবা, ক্ষমতাই বা আমার কতটুকু ! ঐ সামান্য কটি টাকায় যদি একটি ছেলেরও উপকার হয় তাহ'লে আমি ধন্য হব।"

আর একবার প্রণাম ক'রে কল্যাণ বললে, "মাসীমা, আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা ধন্য হয়ে গেছি।"

৮

সেবক-সমিতির সেক্রেটারী কল্যাণ সানন্দে বেরিয়ে গেল। জয়ার পিতা শোবার ঘরের জানলা থেকে তা লক্ষ্য করলেন। ভাবলেন মনে মনে, কল্যাণও

এসে জুটেছে! জুটবে নাই বা কেন? মা জোগাচ্ছে ইন্ধন, ছেলেমেয়ের দোষ কি? যার টাকায় হচ্ছে সব—তারই সঙ্গে চলছে ছল চাতুরী। মজা মন্দ নয়। এই তো সংসার। কর্তা ম্লানভাবে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

রাত্রি আটটা। মহিলা-সমিতির মেয়েরা সব চ'লে গেছে। জয়ার মনে আজ আনন্দের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে। একটি কর্মীর অন্তত এক মাসের চিকিৎসা-খরচ দিতে পেরেছে। কি মহৎ উদার তার মায়ের প্রাণ! মনে মনে সে মাকে প্রণাম জানাল। মা তো ঘরেই ছিলেন, প্রণাম করলেই পারত, কিন্তু তাতে জয়ার ভারি লজ্জা। 'মা, ও মা'—চীৎকার ক'রে গলা ফাটিয়ে সারা বাড়ী ঘুরতে আরম্ভ করলে সে।

গৃহিণী তখন কর্তার খাবার সাজাচ্ছিলেন ওপরে, কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বহু পুরাতন বেয়ারা মতিলাল। বললেন গৃহিণী, "দিদিমণিকে ডেকে আন্ এখানে।"

বেয়ারা চ'লে গেল। জয়াকে ডাকবার আগেই, সে এসে হাজির হলো। মেয়েকে দেখে গৃহিণী বললেন, "ভয়ানক গম্ভীর হয়ে রয়েছেন, তুই খাবারটা দিয়ে আয়।"

"কেন মা, বাবা কি রাগ করেছেন? না, শরীর আবার খারাপ হয়েছে?"

"হয়তো দুইই। আটটা বেজে গেছে, তুই যা তাড়াতাড়ি।" ব'লে মেয়ের হাতে খাবারের থালাটা তুলে দিলেন। বেয়ারাটা পেছন পেছন আসছিল। গৃহিণী বারণ করলেন যেতে। জয়া খাবারের থালা নিয়ে খাটের সামনের টেবিলের উপর রাখল। পিতার মুখের দিকে চেয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট। রায়বাহাদুর শুয়ে রয়েছেন চোখ বন্ধ ক'রে। বুকের উপর হাত দুটি প'ড়ে আছে। মুখ সাদা ফ্যাকাসে বিবর্ণ, কে যেন সব রক্ত নিংড়ে নিয়েছে মুখ থেকে। জয়া ভাবলে, নিশ্চয়ই অসুখ বেড়েছে, নয়তো টাকা নিয়ে মায়ের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়েছে। যা হোক কিছু একটা হয়েছেই। ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলোতে লাগল জয়া। ঈষৎ চোখ

খুলেই আবার বন্ধ করলেন রায়বাহাদুর। এপাশে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মাথার উপর পাখা ঘুরছে বোঁ-বোঁ ক'রে। খাবার জুড়িয়ে হিম হয়ে গেল বোধ হয়। কাজেই জয়া আস্তে আস্তে নম্র সুরে বললে, "বাবা, খাবে না ? খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল !"

রায়বাহাদুর বললেন, "আজ শরীর মন কোনটাই ভালো নেই মা, তাই খাবারও ইচ্ছে নেই। আজ আর খাব না।"

"না বাবা, তা হয় না। খেতেই হবে তোমাকে। তুমি আমার ওপর রাগ ক'রে খেতে চাইছ না—এ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।"

জয়ার এ সামান্য কথায় গ'লে পড়লেন তিনি।

"দূর পাগলী, তোর ওপর শুধু শুধু রাগ করব কেন ?"

"রাগ যদি না ক'রে থাক, লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে নাও তো।"

রায়বাহাদুর উঠে বসলেন বিছানার উপর। জয়া টেবিলটা সরিয়ে দিলে খাটের দিকে। খেতে খেতে তিনি বললেন মেয়ের দিকে চেয়ে, "কি হলো রে তোদের আজ মিটিংয়ে ?"

জয়া আশ্চর্য হয়ে গেল মনে মনে। বাবা মিটিংয়ের কথা জানতে চাইছেন ?

আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি রে, চুপ ক'রে রইলি যে ?"

"ভালো ক'রে সেন্টারগুলো চলছে না। কি করলে চলতে পারে তারই একটু আলোচনা হলো। পিস কমিটির কি করা এখন কর্তব্য, কি ভাবে আন্দোলন চালাতে হবে—এ সব নিয়েও আলোচনা হলো। টাকার বাবা বড্ড অভাব," বললে জয়া, "টাকার জন্যে কাজ চলছে না।"

রায়বাহাদুর হেসে বললে, "বেশ শাঁসালো দেখে একজনকে বিয়ে কর্, তারই টাকায় চলবে বেশ ভালো ক'রে সমিতি।"

লজ্জা পেয়ে জয়া বললে, "শাঁসালো দেখে বিয়ে করতে হবে কেন ? আমার বাবার কি শাঁস কম ?"

"আমার আর শাঁস কোথায় মা ? আমি জমিদারও নই, আর ব্যবসাদারও নই। চাকুরীজীবীদের কি টাকা থাকে মা ?"

"ইচ্ছেটাই আসল কথা বাবা। হৃদয় না থাকলে টাকা থেকে কোনও লাভ নেই। আমাদের দেশে কি ধনী নেই? ক জন সাহায্য করে গরীবকে? বদখেয়ালে উড়িয়ে দেয় হাজার হাজার টাকা। অথচ সৎকাজে চাইতে গেলে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়। বড়লোকে আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে বাবা। তার চেয়ে মধ্যবিত্তরা অনেক ভালো। নিজেরা দুঃখী, তাই গরীবের দুঃখ বোঝে।"

"তুইও তো বড়লোক, অন্তত তোর সমিতি তো তাই বলে। গরীবের দুঃখে তোর তো প্রাণ ফাটে!"

"বড়লোক কিসের? এক পয়সা উপায় করতে পারি না, এখনও ব'সে ব'সে তোমার ঘাড়ে খাচ্ছি।"

"আমার টাকা কি তোর টাকা নয়?"

লজ্জিত ভাবে জয়া বললে, "তোমার টাকা আমার হ'লেও, তবু—"

"তবু কি রে পাগলী?"

জয়ার সঙ্গে এ সব কথাবার্তা শুনলে কে বলবে, ছেলে-মেয়ের কাজের উপর রায়বাহাদুরের কোন সহানুভূতি নেই! আবার এই মানুষই, ছেলে-মেয়ের কাজের জন্যে স্ত্রীকে ব্যঙ্গোক্তি করেন। সময় সময় তীব্র কটূক্তি করতেও ছাড়েন না। সকল মুখরতা নীরব হয় তাঁর জয়ার কাছে। মনে যত অসন্তোষই থাক্, মেয়ের কাছে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারেন না।

বড়দাদা অনিল এসে ধরলে জয়াকে, রায়বাহাদুরের মত করিয়ে কিছু টাকা তাকে দিতে, তাছাড়া বম্বেতে পিস কমিটির অধিবেশনে সে যেতে চায় তাও শুনিয়ে দিতে। জয়া প্রবল আপত্তির সুরে বললে, "দাদা, ওসব আমি পারব না বলতে। তুমি বলগে যাও।" তারপর একটু হেসে জয়া বললে, "এই বুঝি তোমার চাকরী খোঁজা হচ্ছে?"

"চাকরী কি গাছের ফল, চাইলেই পাব? চেষ্টা তো করছি, মিলছে কই? এখন ছাঁটাইয়ের যুগ জানিস তো?"

"হোক ছাঁটাইয়ের যুগ, তোমার চেষ্টারও ত্রুটী হচ্ছে। সব কাজ ছেড়ে ভালো ক'রে খোঁজ কর। সব সময় বাবার কাছে হাত পাতা কি যায় ?"

"যায় না ব'লেই তোকে বলছি। লক্ষ্মিটি বোন, আমার জন্যে বাবার কাছে একটু বল্। তুই হচ্ছিস আদরের মেয়ে, যা বলবি তাই শুনবেন।"

অনিলের গলার শব্দ পেয়ে রায়বাহাদুর ডাকলেন, "কে রে, ওখানে কথা বলছিস ? অনিল নাকি ?"

এই রে!—মনে মনে ব'লে উঠল অনিল। তারপর জোর গলায় উত্তর দিলে, "হ্যাঁ বাবা, আমিই।"

অনিল বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে রায়বাহাদুর বললেন, "চাকরীর কিছু হদিস্ মিলল ?"

কুণ্ঠিত স্বরে অনিল বললে, "সারা দিনই তো চেষ্টা করছি।"

"হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছ, ভুগতে হবে বৈ কি। ফোন ক'রে দে সন্তোষকে, আজ বিকেলে যেন একবার আসে।"

"দিচ্ছি বাবা এখুনি।"—ব'লে অনিল চ'লে গেল।

জয়া ভাবতে লাগল, বেলাদি বলছেন সমিতির তরফ থেকে মাত্র সাত দিনের জন্যে বম্বে যেতে, কি করা তার উচিত ? কথাটা পেড়ে দেখবে কি ? বাবা মত করবেন ? দেখাই যাক্ কথাটা ব'লে বাবার কাছে। জয়া রায়বাহাদুরের কাছে এসে বললে, "বাবা, তোমার শরীর কি খারাপ হলো নাকি ?"

"কেন বল্ দিকি ?"

"সন্তোষ-কাকাকে ডাকতে পাঠালে যে ?"

"হার্টের অসুখ তো, মাঝে মাঝে দেখানো দরকার। তাছাড়া গল্পগুজবও হয়। একা একা থাকি, ভালো লাগে না।"

"তা তো ঠিকই।" তারপর একটু থেমে বললে, "দিন সাতেক আমি না থাকলে তোমার কি খুব অসুবিধে হবে ?"

"কেন এ কথা বলছিস মা ? কোথায় যেতে চাস তুই ?"

"পিস কমিটির অধিবেশন হবে বম্বেতে, বেলাদি বলছিল আমায় ডেলিগেট হোতে, তোমার যদি মত হয় একবার ঘুরে আসতাম। ওখানে নলিনীকাকাও আছেন, তাঁর বাড়ীতেই থাকতাম।"

"টিকিট কেনা হয়েছে ?"

"তোমার মত না পেলে টিকিট কিনব কি ক'রে ?"

"কবে যাবে সব ?"

"তরশু।"

"বেশ তো, যাবি বৈ কি। এ কদিন তোর বুড়ো ছেলে ঠিকই থাকবে। তোর বেলাদিকে জানিয়ে দে যাবি ব'লে। আর কালই সকালে অনিল কি সুশীলকে টিকিট কিনতে পাঠিয়ে দে।"

জয়া আশ্চর্য হয়ে গেল। বাবার একটুও আপত্তি হলো না! আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মায়ের কাছে গিয়ে বললে জয়া, "মা, বাবা মত করেছেন আমার বম্বে যাবার। কাল সকালে টিকিট কাটাবার ব্যবস্থা করতে বলেছেন।"

গৃহিণী কিছুই জানতেন না, বললেন, "হঠাৎ বম্বে কেন ?"

"বম্বেতে পিস কমিটির অধিবেশন হবে। ডেলিগেট হয়ে যাচ্ছি আমি। বড়দারও খুব ইচ্ছে, কিন্তু সাহস ক'রে বলতে পারছে না। আজই জানিয়ে দি বেলাদিকে, আমি যেতে পারব ব'লে।"

জয়া সারাদিন কাপড়-চোপড় গুছোতে লাগল। অনিল নিষ্ফল আক্রোশে চেয়ে রইল বোনের দিকে।

"নিজের কাজ বেশ গুছিয়ে নিতে পারিস তো ?" বললে অনিল।

"বিশ্বাস কর দাদা, এক কথাতেই বাবা রাজী হয়ে গেলেন। তোমার নাম আমি সাহস ক'রে বলতেই পারলাম না।"

"আমার নাম বললে নিশ্চয়ই মত করতেন না, অসুখ বেড়ে যেত।"—ব'লে মুখ ভার ক'রে বেরিয়ে গেল সে বোধ হয় চাকরীর খোঁজেই।

পরদিন সকালে চা খাবার পর টিকিট কিনতে সুশীলকে পাঠাবার ব্যবস্থা করছে, এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। রায়বাহাদুরের হঠাৎ

নিশ্বাসের কষ্ট বেড়ে গেল, হাত পা সর্ব শরীর ঝিম্ ঝিম্ করতে আরম্ভ করল, তিনি চোখ কপালে তুলে টেনে টেনে নিশ্বাস নিতে আরম্ভ করলেন, ছেলে মেয়ে সকলে ছুটে এল। অনিল সুশীল জয়া সকলে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সন্তোষ ডাক্তারকে ফোনে খবর দাওয়া হলো। হার্টের অসুখ ধরবার পর থেকে এত বাড়াবাড়ি হয় নি কখনও। কি করা যায়? ঠাকুর চাকর বেয়ারা আয়া ঝি সকলেই ভয়ে ভয়ে হরিনাম জপ করতে লাগল। কেবল ব্যস্ত হলেন না গৃহিণী। তিনি শান্ত মনে, প্রশান্ত বদনে, স্বামীর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে কি যেন নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

৯

মা কি এমন দেখছেন একাগ্র মনে? কি আছে বাবার মুখে? কৈ, মায়ের মুখে তো কোন উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না? মা তো ব্যস্ত হচ্ছেন না? কি কারণ? হয়তো কারণ কিছুই নেই, এ তার ভুল ধারণা। ভগবানে বিশ্বাসী মা তাঁর সংসারের সব কিছু অশান্তি বিপর্যয় দুঃখ কষ্ট শোককে শান্ত ভাবে গ্রহণ করাই উচিত মনে করেন। জয়া পিতার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অনেক কথাই ভাবতে লাগল। অনিল এসে চুপি চুপি জয়াকে বললে, "ডাক্তার-কাকা কোথায় কলে বেরিয়েছেন, কাকিমা বললেন—এলেই পাঠিয়ে দেবেন। তবে শিগ্‌গির আসবেন কিংবা ফিরতে দেরী হবে তা বলতে পারলেন না। কি করব? অন্য ডাক্তার ডাকব? বাবার যেমন অবস্থা দেখছি, বিশেষ ক'রে হার্ট-ডিজিজ—ভীষণ সাংঘাতিক অসুখ, সবুর করা কি উচিত?"

জয়াও চুপি চুপি বললে, "সবুর করা ডাক্তার-কাকার জন্যে বোধ হয় ঠিক হবে না। অন্য ডাক্তার ততক্ষণ ডাক, তারপর ডাক্তার-কাকা এলে দেখবেন।"

রায়বাহাদুর শরীরের অত কষ্টের মধ্যেও ভাই-বোনের ফিস্‌ফিসানি শুনতে পেয়েছেন। চিঁ-চিঁ স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "অন্য ডাক্তার ডাকতে হবে না। এ বুড়ো অত সহজে যাবে না। সুশীলকে দেখছি না যে? সে কোথায়?"

জয়া বললে, "ছোটদা বাজারে গেছে, এই এল ব'লে।"

কথাগুলি রায়বাহাদুর চোখ বন্ধ ক'রেই বলছিলেন।

এবার কন্যার দিকে চোখ ঈষৎ খুলে বললেন, "টিকিট কাটাতে দিয়েছিস?"

জয়া বললে, "না বাবা, তোমাকে এ অবস্থায় দেখে আমি কি যেতে পারি?"

হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে থেমে বললেন রায়বাহাদুর, "না না, তুই টিকিট কাটাতে দে। এরা তো আছেই সব আমার কাছে। আমি টাল সামলে নিয়েছি।" ব'লেই চোখ কপালে তুলে গোঁ-গোঁ করতে লাগলেন। অনিল জয়া ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে টেলিফোনের কাছে ছুটে গেল ডাক্তারের জন্যে। রায়বাহাদুর ইসারায় একটু জল খেতে চাইলেন। জয়া ফিডিং কাপে জল ঢেলে তাঁর মুখের কাছে ধরল। ধীরে ধীরে একটু জল খেয়ে তিনি তাদের ডাক্তার ডাকতে নিষেধ করলেন।

জয়া বললে, "বাবা, তুমি কথা ব'লো না। চুপ ক'রে চোখ বুজে থাক।"

রায়বাহাদুর রুগ্ন গলায় বললেন, "আমার কিছু হবে না রে, বুড়োদের প্রাণ কি সহজে যায়? কর্তব্য যখন ঘাড়ে নিয়েছিস, তখন—" ব'লে হাঁপাতে সুরু করলেন।

জয়া ব্যস্ত হয়ে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "আঃ বাবা, তোমায় বারণ করছি কথা বলতে, তবুও বলবে! চুপ ক'রে লক্ষ্মী ছেলের মত শুয়ে থাক। দেখি ফোনে ডাক্তার-কাকাকে পাই কি না!"

এমন সময় গরম খানিকটা দুধ নিয়ে বেয়ারা প্রবেশ করল। জয়া দুধটুকু ফিডিং কাপে ঢেলে পিতার মুখের কাছে ধরল।

"বাবা, দুধটুকু খেয়ে ফেল। তারপর ডাক্তার-কাকা এলে যা পথ্যের ব্যবস্থা করবেন তাই খাবে।"

"আবার দুধ মা ?"

"হ্যাঁ বাবা, দুধ না খেলে কিইবা খাবে ?"

"আচ্ছা, দে মা।"

খাওয়া হ'লে মুখ মুছিয়ে জয়া বুকে হাত বুলোতে লাগল। রায়বাহাদুর আপত্তির সুরে বললেন, "বেলা হয়েছে, তোরা নাইবি খাবি না ? যা, তোর মাকে পাঠিয়ে দে।"

সুশীল জয়া বেয়ারা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই গৃহিণী প্রবেশ করলেন। স্ত্রীকে দেখে স্বাভাবিক অথচ চাপা সুরে বললেন তিনি, "এ গরমে বল তো এখন আমি কি খাই ? শুধু তোমারই জন্যে আমার এই শাস্তি।"

"শুধু শুধু চোখ উল্‌টে চিঁ-চিঁ করতে তোমায় কে বলেছিল ? এখন আমার দোষ দিলে কি হবে ?"

"শুধু শুধু বৈ কি ! কল্যাণ এসেছিল সেদিন, সে নিশ্চয় ডেলিগেট হয়ে যাচ্ছে, জয়াও যেতে চায়। কি করব, অসুখ বাড়াতে হলোই আমাকে। এখন আমার খিদেয় পেট চুঁ-চুঁ করছে, কি করি ?"

"কি করবে আমি কি জানি ? অসুখের ভান করতে কি আমি বলেছিলাম ? ছেলে মেয়ে বড় হয়েছে, তাদের স্পষ্ট ক'রে তোমার মনের ইচ্ছেটা ব্যক্ত করলেই পার। কথা শোনে ভালো, না শোনে কোনও সম্বন্ধ রেখো না। এসব ছল-চাতুরী করবার দরকার কি ?"

মুখভঙ্গি ক'রে রায়বাহাদুর বললেন, "আমি সম্বন্ধ না রাখলেও তুমি রাখবে তো ? আরও ভালো ক'রে তাদের রাস্তার দিকে ঠেলে দেবে। তোমাকে আমি ভালো ক'রেই জানি।"

এসব কথার উত্তর দিলে ঝগড়া বেড়েই যাবে ভেবে গৃহিণী চুপ ক'রে রইলেন।

সন্ধ্যের সময় সন্তোষ ডাক্তার আর তাঁর স্ত্রী এলেন।

সন্তোষ ডাক্তার বললেন, "কি হে, আবার অসুখ বাড়ালে কেন?"

"কি করব বল? তোমার ওষুধ কাজের হ'লে নিশ্চয়ই অসুখ বাড়ত না।"

"তাই নাকি? আমার ওষুধ তাহ'লে অকেজো হয়ে গেল?" সামনে উপবিষ্ট জয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনলে জয়ারাণী, তোমার বাবার আমার ওষুধের ওপর ভক্তি কেমন? এবার এ বাড়ী থেকে পাততাড়ি গুটোতে হবে দেখছি।"

জয়া হেসে বললে, "কাকাবাবু, বাবার ওটা মুখের কথা। আজ সকালে যখন বুকের ব্যথা আর শ্বাসকষ্টে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন আমরা চুপিচুপি বলাবলি করছিলাম—'ডাক্তার-কাকা তো বাড়ীতে নেই, এখনকার মত অন্য ডাক্তার ডাকা হোক।' অত কষ্টের মধ্যেও বাবার কানে ঠিক গেছে কথাটা, 'না না' ব'লে আপত্তি ক'রে উঠলেন। আপনার ওপর অগাধ বিশ্বাস বাবার।"

"বিশ্বাস না ক'রে উপায় কি?" ব'লে মুচকি হেসে একবার বন্ধুর দিকে চাইলেন। "আচ্ছা, এবার জয়ারাণী তোমার বাবাকে পরীক্ষা করা যাক।"

ডাক্তারবাবু রায়বাহাদুরের বুক পিঠ নাড়ী পরীক্ষা ক'রে বললেন, "জয়ারাণী, তোমার তত্ত্বাবধানে সন্তোষ আছে, তা সত্ত্বেও অসুখ বাড়ল কি ক'রে?"

লজ্জিতভাবে জয়া বললে, "ওষুধ পথ্য ঠিক সময়মত তো দেওয়া হচ্ছে কাকাবাবু।"

"হার্ট ডিজিজে ওষুধ বিশেষ কিছু নেই। কোন উত্তেজনার কারণ ঘটেছে কি?"

উত্তেজনার কারণ? জয়া আকুলভাবে চিন্তা করতে লাগল। তবে বম্বে যাবার প্রস্তাবই কি উত্তেজনার কারণ? কিন্তু পিতাই তো খুশীমনে

তাকে অনুমতি দিয়েছেন। রোগশয্যায় শুয়েও বারে বারে তাকে বম্বে চ'লে যেতে বলেছেন। কাজেই এটা তো কারণ হতে পারে না।

"আমি তো বুঝতে পারছি না কাকাবাবু—কেন অসুখ বাড়ল?"

"যাই হোক মা, তোমরা একটু বুঝে সুজে চলবে। এ অসুখের কথা বলা যায় না। ভাইদের ব'লো—বিনা কাজে শুধু শুধু বাইরে যেন ঘোরে না। এ রোগের প্রকৃত ওষুধ—মনের প্রশান্তি। কোন কারণে একটু উত্তেজিত হ'লেই রোগ বেড়ে যাবে।"

এমন সময় বেয়ারা চা খাবার এনে টেবিলে রাখল। রায়বাহাদুর চিঁচিঁ স্বরে বললেন, "বন্ধু, চা খাবার খেয়ে নাও।"

পাশের ঘরে ডাক্তারের স্ত্রী তখন জয়ার মার সঙ্গে কথা বলছিলেন। রায়বাহাদুরের গৃহিণী বললেন, "ছেলেমেয়েকে ঘরে বাঁধবার জন্যে দিনের পর দিন রুগী সেজে প'ড়ে থাকা কি ভীষণ ব্যাপার!"

ডাক্তার-গৃহিণী বললেন, "ঠিকই। খুব ভালোবাসেন ছেলেমেয়েকে। ওদের চিন্তাতেই উনি অস্থির। ওদের ভবিষ্যতের চিন্তায় কত কষ্ট করছেন, কোন বাপ এ রকম করে না।"

"তা ঠিকই, তবে এ যেন বাড়াবাড়ি আমার মনে হয়। ভয় দেখিয়ে ছেলেমেয়েকে কি ঘরে রাখা যায়? তাদের বুঝিয়ে বলতে হয়—বিয়ে-থা ক'রে ঘর সংসার করুক। আমিও তাই চাই, কিন্তু একবারে বাইরের কোন কাজ করবে না, কেবল নিজেরটি—এ আমার পছন্দ নয়।"

"রায়বাহাদুর জানেন তোমার মত?"

"জানেন বৈকি, দেখি না কত দূরের জল কত দূর গড়ায়! তাই চুপ ক'রে আছি।"

এমন সময় জয়া ট্রেতে তিন কাপ চা, তিন প্লেট খাবার নিয়ে এল।

"কাকীমা, চা খান। মা, তুমি নাও।" ব'লে নিজের কাপে চুমুক দিল।

ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। বহু খোঁজার পর অনিল একটি কাপড়ের কলের ম্যানেজারের পদ পেল। গৃহিণী অনিলকে বললেন, "ভালো ক'রে মন দিয়ে কাজ ক'রো। মনে রেখো তুমি মাইনে নিয়ে কাজ করছ, মনিবের স্বার্থের হানি যেন না হয়। চাকরী ষোল আনা বজায় রেখে তবে অন্য কাজ।"

জয়া আবদার ক'রে বললে, "দাদা, প্রথম মাসের মাইনের সিকি আমার সমিতি পাবে।"

"আর সেবক সমিতিকেও কিছু দেওয়া দরকার। টাকার জন্যে কাজ এগোচ্ছে না।"

"দাদা, আমারও চাকরী করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তাহ'লে আবার বাবার অসুখ বেড়ে যাবে। তোমার চাকরী হয়েছে শুনে বাবার কি আনন্দ! বারে বারে বলতে লাগলেন, 'আমার অর্ধেক রোগ সেরে গেল জয়া।' বাবা ভেবেছিলেন, আর বোধ হয় তোমার চাকরী হবে না।"

মৃদু হেসে অনিল বললে, "আমার চাকরী হতে বাবার অর্ধেক রোগ সেরেছে, আর অর্ধেক সারবে তোর বিয়ে হ'লে।"

"ইস্, বিয়ে করছি আমি! কখনোই নয়। তার চেয়ে তোমার চাকরী হলো, তুমিই কর আগে। তুমি বড়, তোমারই করা দরকার। বউ এলে আমাদের সকলের সুবিধে হয়।"

"যাক ওসব কথা। তোর টিউবওয়েলের কি হলো?"

"বলতে সাহস করছি না দাদা। যদি অসুখ বেড়ে যায়?"

"এ কথা বললেই অসুখ বেড়ে যাবে? তিনি নিজেই তো ক'রে দেবেন বলেছিলেন? বাবা এখন খোস-মেজাজে আছেন, কথাটা তোল্ না আজ।"

সে দিনই কথাটা তুললে জয়া। বললে, "বাবা, টিউবওয়েলটা চেঞ্জে যাবার আগে হ'লে ভালো হোত।"

রায়বাহাদুর হেসে বললেন, "পাগলী, ভুলিস নি দেখছি।"

"বা রে, কার মেয়ে আমি দেখতে হবে তো? এত সহজেই ভুলে যাব?" তারপর আবদারের সুরে বললে, "বাবা, কবে দেবে ক'রে?"

"দেব রে, দেব। শরীরটা একটু চাঙ্গা হোক।"

মুখ ভার ক'রে ব'সে রইল জয়া। রায়বাহাদুর কন্যার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "পাগলী, রাগ করলি?"

"ওরা জলকষ্টে ম'রে গেলে আর টিউবওয়েল ক'রে কি হবে? আমার গয়না বিক্রী ক'রে ওদের জলকষ্ট দূর করব।"

"না না, তা তোকে করতে হবে না।" তারপর একটু থেমে বললেন, "আচ্ছা, তোকে কথা দিচ্ছি, আজ থেকে দু মাসের মধ্যে টিউবওয়েল হয়ে যাবে "

"সত্যি বাবা, ঠিক বলছ তো?"

"হ্যাঁ রে পাগলী।"

১০

নিদাঘতপ্ত বারিহীন ধরণী, সমস্ত জীব-জগৎ এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্যে চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, বিশেষ ক'রে গরীব চাষীর দল। দলে দলে তারা জলদেবতার পূজো দিচ্ছে, ব্যাকুল প্রার্থনা জানাচ্ছে। কিন্তু হায়, কলির দেবতা কর্ণপাত করছেন না তাদের কথায়। সমস্ত বৈশাখ চ'লে গেল, একদিন কাল-বৈশাখী হলো না। ফুটি ফাটার ন্যায় বস্তির মাটি গেছে ফেটে, গাছপালা যাচ্ছে জ্ব'লে পুড়ে, আর মানুষ—বিশেষ ক'রে মাটির খোলার ঘরের মানুষ কোন রকমে জীবন্মৃত হয়ে 'হা ভগবান, হা ভগবান' ক'রে বুকের বোঝা হাল্কা করছে। জয়ার মনে প্রশ্ন জাগে—ভগবান কি আছেন? অবিশ্বাসী মানুষের সেই চিরন্তন প্রশ্ন। ভগবান থাকলে মানুষের এত দুঃখ কষ্ট? তিনি কি দয়াময়? মনের ভিতর থেকে কোন উত্তর খুঁজে পায় না জয়া। দুর্ভিক্ষে, ঝড়ে, বন্যায় ভূমিকম্পে মহামারীতে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী লোক মরছে ঠিক

কীট-পতঙ্গের মত। এতে কি ঈশ্বরের একটু দয়া হয় না, কিংবা এ সব নিবারণ করবার তাঁর ক্ষমতা নেই! বৃথাই তাঁকে বলা হয়, সর্বশক্তিমান দয়াময় ঈশ্বর। ব্যথায় মন তার টনটন ক'রে ওঠে। চোখ দুটিতে জল ভ'রে আসে, ঈশ্বরের উপর হয় অভিমান। জয়া তাকিয়ে থাকে রুক্ষ পিঙ্গল আকাশের দিকে। নিজের অজ্ঞাতেই বারে বারে প্রার্থনা জানায় সেই নিষ্ঠুর দেবতার পায়ে।

বস্তি থেকে কান্নার রোল উঠেছে। কলেরায় মরছে নির্বিবাদে ছেলে মেয়ে বুড়ো। না আছে ডাক্তার, না আছে ওষুধ, কে কার মুখে জল দেয়? এ সব শুনে কি চুপ ক'রে থাকা যায়? বিশেষ ক'রে এতটুকুও মনুষ্যত্ব আছে যার? কর্মী মেয়ে জয়া চঞ্চল হয়ে উঠল। ইচ্ছে করল তার ছুটে চ'লে যেতে বস্তিতে। কিন্তু বস্তিতে গেলে এধারে যে পিতার অসুখ ভয়ানক বেড়ে যাবে। অথচ চুপ ক'রে ব'সে থাকাই কি উচিত? মায়ের কাছে গেল জয়া।

"মা তুমি কি বল? ওদের ফ্যামিলিকে ফ্যামিলি উজোড় হয়ে যাচ্ছে। আর আমি চোখ কান বন্ধ ক'রে থাকব?"

"তুই কি করতে চাস? ও রোগ বড় ছোয়াচে।"

"কিছু হবে না আমার, সাবধানে থাকব।"

"তা না হয় বুঝলাম, কি করতে চাস তুই?"

"ওদের ডাক্তার ওষুধ পথ্য সেবার ব্যবস্থা করব। কর্পোরেশনের ডাক্তারকে নিয়ে যাব। আমার সমিতি আর সেবক সমিতিকেও খবর দেব। চাঁদা তুলে বস্তিটা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করতেই হবে। ফিনাইল, ব্লিচিংপাউডার চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে কাঁচা নর্দমাগুলোতে যাতে ময়লা জল না জমে তার ব্যবস্থা করা, জঙ্গলগুলো পুড়িয়ে ফেলা—কত কাজ, কাজের কি অভাব?"

কন্যার কথাগুলো শুনে গৃহিণী চুপ ক'রে রইলেন। জয়া অধৈর্য স্বরে বললে, "কি মা, চুপ ক'রে রইলে যে?"

"উনি ওসব শুনলে উত্তেজিত হয়ে উঠবেন, তার ফলে হয়তো আবার অসুখ বাড়বে। ঠাকুরপো কি ব'লে গেছেন জানিস তো? শেষে একটা অনর্থ হবে। হার্টের অসুখ—কখন কি হয় বলা যায় না তো?"

জয়া একটু চিন্তা ক'রে বললে, "তুমি এক কাজ কর মা, বাবাকে একটু মিথ্যে কথা বোলো। আমার বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গেছি বোলো। তাহ'লে বাবার রাগ হবে না।" তারপর কি যেন একটু ভেবে বললে, "আচ্ছা, আমিই বলছি।"

রায়বাহাদুর তখন একটা গল্পের বই পড়ছিলেন। জয়া তাঁর কাছে গিয়ে বসল। রায়বাহাদুর বই থেকে চোখ তুলে বললেন, "কি মা, কি করছিলে এতক্ষণ?"

"মা চপলাকে আসতে বারণ ক'রে দিয়েছিলেন, তাই একটু ঘরের কাজের সাহায্য করছিলাম।"

"চপলাকে বারণ করা হয়েছে কেন?"

"বস্তিতে ঘরে ঘরে কলেরা লেগেছে বাবা। ওরা তো বোঝে না কিছু, ঐ কাপড়েই চারদিক ছোঁয়া ন্যাপা করবে, তাই মা বললেন—এখন চপলা, তোমার আসবার দরকার নেই কিছুদিন।"

"ভালোই করেছেন। কলেরা ভয়ঙ্কর অসুখ। ওরা ত জানে না স্বাস্থ্যের বিষয় কিছু, কাজেই বস্তিতে একজনের ধরলে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।"

"কি ক'রে জানবে বাবা? যে যার নিজের চিন্তাতেই ব্যস্ত। ওদের দিকে নজর দেয় না তো কেউ।"

"কার সময় আছে মা, নজর দেবার?"

"ইচ্ছে থাকলে কি নজর দেওয়া যায় না? সবাই যদি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তবে ওদের কি হবে? ওদের ভালো না হ'লে আমাদের ভালো হতেই পারে না। ওরাই তো দেশের কাঠামো। শরীরের এক অঙ্গ যদি পচা থাকে, তবে সমস্ত শরীর ধীরে ধীরে নষ্ট হবে না? তুমি কি বল?"

"কি আর বলব মা? তুই তো মস্ত এক লেকচার দিলি! কিন্তু ছেলেমানুষ বুঝতে পারবি না যে, ওদের ভালো করতে যাওয়া এক কঠিন ব্যাপার। কিছুতেই মানবে না ওরা তোর কথা, উপহাস ক'রে উড়িয়ে দেবে।"

"তা হতে পারে। কারণ ওরা অশিক্ষিত অজ্ঞ, আমাদের কথা ওদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকবে। কিন্তু ধৈর্য ধ'রে দিনের পর দিন বোঝালে ঠিক বুঝবে। আমরা দূরে ঠেলে রেখেছি ব'লেই তো ওদের এই দুর্দশা।"

কন্যার অকাট্য যুক্তির যথাযোগ্য উত্তর না খুঁজে পেয়ে অগত্যা রায়বাহাদুর চুপ ক'রে গেলেন। জয়া উদাসভাবে সামনের দিকে কয়েক মিনিট চেয়ে থেকে বললে, "বাবা, কয়েক ঘণ্টার জন্যে আজ তোমার কাছ থেকে ছুটি চাই।"

"কোথায় যাবি?"

ঢোক গিলে জয়া উত্তর দিলে, "আমার বন্ধু জয়ন্তী এসেছে শ্বশুর-বাড়ী থেকে, তাই আজ দেখা করতে যাব মনে করছি।"

"কোন্ জয়ন্তী রে?"

"আমার সঙ্গে এম. এ. দিয়েছিল যে মেয়েটি, মনে নেই তোমার?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। পাস করার পর তোকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। রোগা ফরসা মতন।"

"হ্যাঁ বাবা, সেই তারই নাম জয়ন্তী। যাব সেখানে দেখা করতে?"

"বেশ তো, যা দেখা ক'রে আয়। অনেক দিন বেরোস নি বাড়ী থেকে। ঘুরে আয়।"

জয়া স্নান ক'রে খেতে ব'সে মাকে বললে, "মা, বাবাকে তো বললাম। কিন্তু একদিনের ব্যাপার তো নয়, যাহোক মিথ্যে ব'লে চ'লে যাবে। এখন একবার সেবক সমিতিতে গিয়ে খবর দি, আর আমার সমিতিটাও ঘুরে আসি।"

"ফিরবি কখন তুই ?"

"ফিরতে সন্ধ্যে হবে। কাল থেকে কাজ আরম্ভ হয় যাতে তার ব্যবস্থা করতেই হবে। বড়দার অফিস, পারবে না। কিন্তু ছোটদা তো পারে ?"

"বলিস সুশীলকে—কি বলে ?"

জয়া খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেলে কর্তা গৃহিণীকে বললেন, "চারদিকে কলেরা লেগেছে। ইন্‌জেকসেন দেওয়া দরকার।"

"ইন্‌জেকসন তো সন্তোষ-ঠাকুরপো বাড়ীশুদ্ধ দিয়েছেন।"

জয়া রাত নটায় ফিরে এলো। বললে, "মা, সব ঠিক ক'রে এলাম। একদল সকালে আর একদল বিকেলে ডিউটি দেবে। আমি সকালেই দেব। সেবক সমিতির জন কয়েক আর আমাদের মেয়েরা সকালে দেবে। তাদের সঙ্গে আমিও থাকব। তুমি সকালের দিকে বাবাকে একটু দেখো। বেলা একটার মধ্যেই আমি এসে পড়ব।"

"উনি জানতে পারলে একটা কাণ্ডই ক'রে বসবেন।"

জয়া ভ্রূ কুঁচকে কয়েক মিনিট চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, "বাবার এতে রাগ হয় হোক। কয়েক ঘণ্টা ছুটীও পাব না, এ কি রকম ব্যাপার! কলেরায় বস্তিটা উজাড় হয়ে গেল, অথচ আমরা দেখব না! তা আমি পারব না মা।"

"ওঁর যদি অসুখ বেড়ে যায় ?"

"অসুখের জন্যে সভা-সমিতি কাজ-কর্ম সব ছেড়েছি। বাড়ীর পাশে বস্তি, সেখানে যাব একটু দেখাশুনা করতে, তাতেই অসুখ বেড়ে যাবে ? ঠিক সময়ে খাব আর ঠিক সময়ে আসব, এতে বাবার ভাববার কি আছে ?"

পরদিন চা খাবার পর জয়া কথাটা নিজেই পাড়ল পিতার কাছে। বললে সাহস ক'রে, "বাবা, এখন আমি একবার বস্তিতে যাব।"

রায়বাহাদুর কন্যার মারাত্মক কথা শুনে চমকে উঠলেন। বললেন, "বলিস কি? বস্তিতে যাবি? মাথা খারাপ হোল নাকি?"

"না বাবা, মাথা আমার ঠিক আছে। কলেরায় বস্তির লোকগুলো সাবাড় হয়ে গেল। কেউ দেখবার নেই—এ আমার সহ্য হয় না।"

"তুই কি করবি? তুই কি ডাক্তার?"

"ডাক্তার আমি নই ঠিকই। কিন্তু আমি তো সেবা করতে পারি? ডাক্তারের ওষুধের ব্যবস্থা করতে পারি? পথ্য রেঁধে দিতে পারি?"

"ঐ মারাত্মক রোগে একার দ্বারা কিছু করাই সম্ভব নয়।"

"একা নয় আমি। সেবক সমিতির ছেলেরা আর আমার সমিতির মেয়েরাও আসবে।"

"এত লোক তো আসবেই। তোর যাবার দরকার কি?"

জয়া মনে মনে অত্যন্ত চ'টে গেল। "তোমার ইচ্ছে—সবাই যাক সেই ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে আর তোমার মেয়ে থাকুক ঘরের কোণে নিরাপদে, এই তো? তাদেরও মা বাপ আছে, তারাও ভাবতে পারে ঠিক এই কথা। সবার সঙ্গে আমিও করব ওদের সেবা—এতে যদি তুমি রাগ কর বাবা আমার উপায় নেই।"

জয়া বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রায়বাহাদুর ম্লানদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কন্যার গতিপথের দিকে। মনশ্চক্ষে ফুটে উঠল তাঁর পঁচিশ বছর আগের একটি ঘটনা। সেদিনও ছিল এমনি রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। গৃহিণী তখন পূর্ণ যুবতী, সন্তানের মা। দেশের কাজে তাঁর আপত্তি জানাতে, ঠিক এমনি ক'রেই উচ্চস্বরে বলেছিলেন—আমি করবই দেশের দুঃস্থের সেবা, তাতে যদি অসন্তুষ্ট হও কিংবা চাকরীর ক্ষতি হয়, তবুও আমি করবই। আর ঠিক এমনি ক'রেই দৃপ্ত ভঙ্গীতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ঘর থেকে—যেমন ক'রে আজ বেরিয়ে গেল জয়া। তারপর থেকেই সুরু হোল তাঁর একক দুঃখময় জীবন। মূর্তিমতী বিদ্রোহিণীর বোঝা বইতে বইতে তাঁর পিঠ গেল কুঁজো হয়ে। আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনার টুঁটি টিপে তিনি হত্যা করলেন। তিলে তিলে মেরে ফেললেন তাঁর

কল্পনা আর স্বপ্নকে। অফিস আদালত থেকে বাড়ী, আর বাড়ী থেকে আদালত—এই করেছেন সারা জীবন ধ'রে। নিঃসঙ্গ জীবনের দুর্বিষহ বোঝায় তাঁর দেহ মন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। কিন্তু কেউ দেখায় নি সহানুভূতি, কেউ দেয় নি সান্ত্বনা,—এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত তৃষ্ণা সহ্য করেছেন কাদের জন্যে? একটি সুদীর্ঘ বেদনা আর দীর্ঘনিশ্বাসের ভিতর দিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিলেন কেবল একটি আশায়। সেই আশাও আজ চরম ব্যর্থতার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। হায়, এই তো জীবন, আর এই তো দুনিয়া!

১১

কয়েক দিন জয়া সুশীল প্রায় নাওয়া-খাওয়া ভুলেই প'ড়ে রইল। সেবক সমিতি আর মহিলা সমিতির কর্মীরাও পালা ক'রে লেগে গেল। এক ঘরে রোগীর ভেদবমি হচ্ছে আর সেখানেই মাথার কাছে ব'সে তার ছেলে খাচ্ছে পান্তা ভাত। আর এক জায়গায় স্বামীর ময়লা পরিষ্কার ক'রে হাত না ধুয়েই ছেলেকে খেতে দিলে, ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছেলে গেল মারা। এদের মূর্খতা আর অজ্ঞতা জয়াকে আশ্চর্য ক'রে দিল। রোগীর সেবার চেয়েও এদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া দরকার। সমিতির কয়েকজন কর্মী করতে লাগল রোগীর সেবা, আর কয়েকজন মিলে বস্তি পরিষ্কারে লেগে গেল। পচা নর্দমা, ছাইয়ের রাশ, গোবরের গাদা, পোড়া কয়লার স্তূপ—সব তারা কর্পোরেশনের ময়লা-ফেলা গাড়ীতে জমাদার দিয়ে তুলিয়ে ফেলে দিলে। এতে অবশ্য বস্তির লোকেরা প্রবল আপত্তি করেছিল। তারা বলেছিল পোড়া কয়লা বিক্রী হয়, গোবর দিয়ে ঘুঁটে ক'রে তাও রাখে বিক্রীর জন্যে—এ সব ফেলে দিলে তাদের দিন চলবে কি ক'রে? পরের দাসত্ব ক'রে এমন কিছু টাকা তারা পায় না যে, শুধু তার উপর নির্ভর করা চলে। কথাটা যদিও ঠিক, তবুও প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আবর্জনা বিদায় করতেই হবে। একজন মাতব্বর বললে, "বাবু, পয়সার অভাবে আমরা দু বেলা পেট ভ'রে খেতে পাই না, ক্ষিধে

সহ্য ক'রে প্রাণ রাখার চেয়ে প্রাণ যাওয়াই ভালো।" সেবক সমিতির একটি কর্মী বললে, "তোমরা যা বললে ঠিকই। কিন্তু কি করবে তোমরা? সহ্য করতেই হবে। ওগুলো দিয়ে যেমন দু পয়সা আসে তেমনি অসুখে কত টাকা বেরিয়ে যায়? কষ্ট অভাব তো আছেই। এদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে চলতেই হবে। উপায় কি? রোগীর কাপড়চোপড় সোডা সাবান দিয়ে ফুটিয়ে নিও। আর খাবার জলটা ফুটিয়ে খেও। সোডা সাবান আর কয়লার ব্যবস্থা আমরা করছি।"

কল্যাণ বললে, "জয়াদি, গরীব দুঃখী মানুষ—নিজের দিকে তাকাবার ওদের সময় কোথায়? আমরা চাঁদা ক'রে একটা টিউবওয়েল করাব আর পায়খানাগুলো সারিয়ে দেব, কি বল?"

জয়া চিন্তিত স্বরে বললে, "এদের মাথার উপর আচ্ছাদনগুলোও সারানো দরকার।"

"এত টাকা একসঙ্গে কি পাওয়া যাবে?"

"টিউবওয়েলের ভার আমি নিলাম কল্যাণ।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে কল্যাণ বললে, "অত টাকা কোথায় পাবে?"

"বাবাকে বলেছিলাম কিছুদিন আগে। তিনি কথা দিয়েছেন দু মাসের মধ্যেই ক'রে দেবেন।"

"খুব ভালো, খুব ভালো জয়াদি। চমৎকার সুখবর।" ব'লে খুসীতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

•

দেশের বৃদ্ধ সরকার মশায় চিঠি লিখেছেন—আর পাকিস্তানে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। নানা রকম অসুবিধা সহ্য করতে হচ্ছে তাঁকে নিত্যই। তিনি আসতে চান কলকাতায়, কেবল কুলদেবতা রঘুনাথের জন্যেই ভাবনা। এ সম্বন্ধে তিনি রায়বাহাদুরের মতামত জানতে চেয়েছেন। রায়বাহাদুর চিন্তায় প'ড়ে গেলেন। অনেক দিন আগেই তাঁর সরকার মশায়কে আনা উচিত ছিল। কেবল রঘুনাথের কথা ভেবেই তিনি চুপ ক'রে ছিলেন। আর নীরব থাকা

যায় না। সরকার মশায় বিপত্নীক। একমাত্র বিবাহিতা কন্যা মলিনা ছাড়া আর কেউ নেই তাঁর। সারাজীবন মিত্র-পরিবারের স্বার্থই রক্ষা ক'রে আসছেন তিনি। মায়া মমতা দয়া দাক্ষিণ্যে ভরা মন তাঁর। স্বার্থপরতা কিংবা কুটিলতার ধার দিয়েও তিনি যান না। সাধারণত গোমস্তা বা সরকার বলতে যে অত্যাচারী মামলাবাজ স্বার্থপর একটি মনুষ্যমূর্তি মনে উদয় হয়, ইনি তার একবারে উল্টো। এমন সদাশিব মানুষ সংসারে বিরল। রায়বাহাদুর লিখে দিলেন সরকার মশায়কে—গৃহদেবতাকে সঙ্গে ক'রে পত্রপাঠ চ'লে আসতে। আর গৃহিণীকে বললেন—তিনতলার ঘর পরিষ্কার করিয়ে রাখতে। ঐ ঘরটিই হবে ঠাকুর-ঘর।

বহুদিন পর বৃষ্টি নামল ঝর ঝর ক'রে। যেন বিধাতার আশীর্বাদ ঝ'রে পড়ল মর্ত্যের জীবের উপর। ধরিত্রী একটু ঠাণ্ডা হলো, রোগের প্রকোপও একটু কমল। রায়বাহাদুর কিছু বললেন না আর জয়াকে। কেবল বললেন, "ওসব বড় ছোঁয়াচে রোগ মা, সাবধানে থাকিস।" সুশীলকেও সাবধান করেন বারে বারে। কিন্তু রাগ করেন না কিংবা তাঁর রোগও বাড়ে না। তবে রোগ আছেই। থাকেন তিনি শুয়ে ব'সেই। বারান্দায় পায়চারী করেন কখনও কখনও, আর বাকী সময় বই প'ড়ে কাটান। অনেক দিন খবর না পেয়ে একদিন সন্তোষ ডাক্তার সস্ত্রীক হাজির। বন্ধুকে দেখে রায়বাহাদুর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, "এস ভাই সন্তোষ, এস। আসুন বৌদি, আসুন।"

গৃহিণীও দুজনকে মহাসমাদরে বসালেন। সন্তোষ ডাক্তার হেসে বললেন, "দেখতে এলাম রোগীটি এত নীরব কেন? হাতছাড়া হলো নাকি?"

"না হে না, হাতছাড়া হয় নি। তুমিও এমন রোগী পাবে না, আর আমিও এমন ডাক্তার পাব না।"

"তবে কল পাচ্ছি না কেন?"

"ঘন ঘন অসুখ বাড়িয়ে লাভ কি? কৌশলটা শেষে ফাঁক হয়ে যাবে। এক চালাকি বারে বারে করলে কেয়ারই করবে না। তাই একটু চুপচাপ আছি।"

"ছেলেমেয়ে এখন কি নিয়ে ব্যস্ত ?"

"অনিল তো এখন চাকরী করছে—শুনেছ বোধ হয় ?"

"না না, তা শুনি নি তো! বেশ, বেশ, খুব সুখবর। এখন সুশীলের একটা হ'লেই খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পার তুমি। তারপর জয়ার খবর কি ?"

"জয়া তো এখন সামনের বস্তি নিয়ে ব্যস্ত। রোজ সকালে ডিউটি দিতে যায়।"

পিতার কথা শেষ হতেই জয়া এসে হাজির। ডাক্তারকে দেখে সোল্লাসে ব'লে উঠল, "আরে কাকাবাবু কাকিমা এসেছেন!" ব'লে দুজনকে প্রণাম করলে। কিন্তু পর-মুহূর্তে তার মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। বাবার অসুখ করে নি তো ? তারপর পিতার দিকে চেয়ে বললে, "বাবার আবার অসুখ বেড়েছে নাকি ?"

"না রে।" রায়বাহাদুর ঘাড় নাড়লেন।

ডাক্তার হেসে বললেন, "আমাকে দেখলেই তোমার আতঙ্ক হয়। অসুখ না হ'লে কি আমি আসি না এ বাড়ীতে ?"

"খুব কম কাকাবাবু। এত কম যে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।"

"তা ঠিক বলেছ। এসে আর কি করব বল, বন্ধু রোগে শয্যাগত, তোমরা দুঃখীর সেবায় ব্যস্ত, আর বৌঠান সংসারের কাজে মগ্ন!"

"আপনার অজুহাত জুৎসই হলো না কাকাবাবু। আমরা মোটেই ব্যস্ত থাকি না। সব সময় ফ্রি। মাও তাই। বাবা তো আপনাকে দেখলে সুস্থ হয়ে ওঠেন। আসল কথা, অভাগা দেশে রোগের মহামারী সব সময় লেগেই আছে। আপনাদের সময় কোথায় ?" ব'লেই আবদারের সুরে ব'লে উঠল, "কাকাবাবু, কিছু ওষুধ আমার বস্তিতে আপনাকে দিতেই হবে।"

হাসতে হাসতে ডাক্তার বললেন, "তোমার আবার বস্তি আছে নাকি ?"

"এই আমাদের সামনের বস্তির কথা বলছি। দেবেন তো ?"

"তুমি যখন বলছ, না দিয়ে রক্ষে আছে ?"

ডাক্তার-গৃহিণীর দিকে চেয়ে বললে জয়া, "কাকিমা, কি দেবেন ?"

"তোমার কাকা আর আমি কি ভিন্ন ? একজন দিলেই হ'লো।"

ঘাড় নেড়ে জয়া বললে, "ওসব শুনছি না। আপনাকে কিছু দিতেই হবে।" তারপর মিনতির সুরে বললে, "কিছু দিন কাকিমা গরীব দুঃখীকে। ওদের পায়খানাগুলো সারানো দরকার। ঘরের ওপরের চালগুলোও সব ফুটো। জলের কষ্ট তো দারুণ। বাবা দেবেন টিউবওয়েল, আমরা চাঁদা তুলে পায়খানাগুলো ঠিক করব। আর আপনি ঘরগুলো মেরামত ক'রে দিন।"

"ওরে বাপ রে, সে যে অনেক টাকার দরকার !"

জয়া ঠোঁট উলটিয়ে বললে, "এ কি ইমারত সারাবেন যে অনেক টাকার দরকার ? কুড়েঘরগুলো সারাতে এমন কি লাগবে ? দেবেন না কাকিমা ? মাত্র কয়েক-শ টাকা হ'লেই হয়।"

মৃদু হেসে ডাক্তার-গৃহিণী বললেন, "যদি না দিই কি করবে তুমি ?"

"তা হ'লে আপনার দোরগোড়ায় অনশন আরম্ভ করব। অবস্থা যখন আছে, কেন দেবেন না ?"

চক্ষু দুটি কপালে তুলে ডাক্তার-গৃহিণী বললেন, "ওরে বাবা, রক্ষে কর— দোহাই তোমার, অনশন করতে হবে না। এ যে গান্ধীজীর পলিসি ধরলে ! কাল যেও, চেক লিখে দেব !"

গৃহিণী বললেন, "জয়া, কাকা-কাকির কাছে তো খুব আদায় করলে, এখন একটু মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা কর।"

জয়া মিষ্টি হেসে বললে, "কাকা-কাকির কাছে চাইব না তো কার কাছে চাইব ? যাচ্ছি আমি চায়ের ব্যবস্থা করতে।" ব'লে উৎফুল্লভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সরকার মশায়ের কন্যা মলিনা এসে পিছন থেকে ধাক্কা দিলে জয়াকে।

"কি ভাবো ভাই জয়াদি একমনে, শুনতে পারি কি?"

"ভাবছি ভাই দামিনীর কথা। ভাবছিলাম কি ক'রে দামিনী পাষাণের সেবায় নিজেকে এমন ক'রে বিলিয়ে দিতে পারল?"

মলিনা দুঃখিত স্বরে বললে, "কি করবে বল? হিন্দু-বাড়ীর ভালো জাতের বিধবা কি করতে পারে?"

"কেন, বিয়ে ক'রে ঘর-সংসার করলে কি হয়? তোমরা যাকে ছোট জাত বল তাদের বিধবারা তো বিয়ে করে। এরাই বা করে না কেন? আমাদের শাস্ত্রে বিধবা বিয়ের তো নিষেধ নেই? দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছ তো? তিনি তো বিধবা বিয়ে শাস্ত্রসম্মত ব'লে অনেক প্রমাণ দেখিয়েছেন। শুধু কি তাই? বিধবা বিয়ে বৈধ করবার জন্যে আইনও পাস করিয়েছেন। আমাদের সমাজেই কিছুতেই তিনি চালু করতে পারলেন না।"

মলিনা বললে, "তা ঠিক জয়াদি। দামিনীর কপাল ভালো, তাই তোমাদের সংসারে এসে জুটেছে, আর ঠাকুর দেবতা নিয়ে রয়েছে। নয় তো বিধবাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।"

"শুধু কি তাই? কত বিধবা আত্মীয়-স্বজনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে বাজারে ব্যবসা করে, কেউ বা আত্মহত্যা করে। এই জন্যেই হিন্দু সমাজ ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।"

"সে কথা ঠিক জয়াদি।"

এমন সময় সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। মলিনা যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললে, "রঘুনাথের আরতি হচ্ছে। যাই আমি। যাবে তুমি?"

"না ভাই, তুমি যাও। আমি থাকি এখানে। সবাই আরতির কাছে গেলে বাবা একেবারে একা প'ড়ে যাবেন।"

মলিনা চ'লে গেল।

জয়া ওখানে ব'সেই হাত জোড় ক'রে মনে মনে প্রার্থনা করলে, "প্রভু, পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট দূর কর। সকলকে শান্তি দাও।" এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠতে জয়া তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল।

"জয়ারাণী, চিনতে পারছ আমায়?"

"ওমা! কাকাবাবু যে, কবে এলেন বম্বে থেকে?"

"এসেছি মা দু দিন হোল।"

"একা এসেছেন?"

"হ্যাঁ মা, একাই।"

"আসুন ওপরে।" ব'লে জয়া দৌড়ে পিতাকে সংবাদ দিল। রায়বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নলিনী বোস ঘরে ঢুকতেই রায়বাহাদুর তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, "এস ভাই, এস। বহুদিন পর দেখা হোল। সব ভালো তো, কবে এলে?"

"আছি ভাই এক রকম। একাই এসেছি। দু দিন হোল এসেছি। তারপর তোমরা কেমন আছ? এত কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ আসছে কোত্থেকে? বাড়ীতে কি আশ্রম বসিয়েছ নাকি?"

"আমাদের কুলদেবতা রঘুনাথের আরতি হচ্ছে। এসেছেন তিনি পাকিস্তান থেকে।"

মৃদু হেসে নলিনীবাবু বললেন, "পাকিস্তান থেকে মানুষই শুধু আসছে না, দেবদেবীও তাহ'লে আসছেন?"

"ভক্তের ভগবান। ভক্তরাই যখন চ'লে এল তখন ভগবানকে আসতেই হবে।"

এমন সময় গৃহিণী এসে উপস্থিত হলেন। হাত জোড় ক'রে নমস্কার ক'রে বললেন, "ঠাকুরপো, সব ভালো তো? কবে এলেন?"

"এসেছি দু দিন হোল। খবর বিশেষ ভালো নয়। গত ফাল্গুনে গিন্নী মারা গেছেন হার্টফেল ক'রে। তা ছাড়া—" ব'লে নলিনীবাবু চুপ করলেন।

উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে কর্তা গৃহিণী জয়া তিনজনই চেয়ে রইল নলিনী-বোসের দিকে। আরও কি দুঃসংবাদ শুনতে হবে কে জানে?

নলিনীবাবু বললেন, "ছায়া স্বামীর সংসারে সুখেই আছে। কিন্তু মায়ার স্বামী আবার বিয়ে করেছে। মায়ার ছেলেমেয়ে হয় নি, তাকে বিলেত পাঠিয়েছি ডক্টরেট্ ডিগ্রীর জন্যে।"

এই নিদারুণ সংবাদে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। কয়েক মিনিট কারুর মুখ থেকে কোন কথা বেরুল না। সকলেরই মনে অভাগী মায়ার মুখখানা জ্বল্‌জ্বল্ করতে লাগল।

রায়বাহাদুর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বললেন, "অমলেন্দু ভালোবেসে মায়া-মাকে বিয়ে করেছিল, কেন এরকম দুর্মতি হোল তার?"

"আর ভাই, মানুষের মনে কখন কি ভাব হয় বলা তো যায় না। পাশের বাড়ীর একটি গরীব যুবতী মেয়ে ওর কাছে সেলাই শিখতে আসত। তারপর এই দুর্ঘটনা।"

সকলেই মর্মাহত হয়ে চেয়ে রইল উদাস ভাবে। কিন্তু জয়া ওখানে বসতে পারল না। তখনও আরতি শেষ হয় নি। সে চ'লে গেল ঠাকুরের সামনে। দামিনী তখন চামর দুলিয়ে বাতাস করছিল রঘুনাথকে। জয়া জোড়হাত ক'রে বললে, "দয়াময় প্রভু, কেন পৃথিবীতে এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত অবিচার, এত প্রবঞ্চনা! দয়াময়, সকলকে দয়া কর, পৃথিবীতে শান্তি দাও।"

১৩

রাত দশটা। জয়ার আজ হোল কি? খাবে না?

"যাও তো মা মলিনা, জয়াকে ডেকে আন। বোধ হয় ছাদেই ব'সে রয়েছে। মায়ার কথাটা শুনে মনটা ওর অস্থির হয়ে গেছে।"

গৃহিণীর আদেশে মলিনা ছুটল ওপরে।

"জয়াদি, কি ভাবছ গো তন্ময় হয়ে, বরের কথা ?"

"তোমাদের তো আর কোন চিন্তা নেই, কেবল একটি কথাই জান।"

উত্তরে মলিনা অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "জয়াদি, রাগ করলে ভাই ?"

"না না, রাগ করব কেন ?

"চল খেতে। জেঠিমা ডাকছেন।"

খাবার টেবিলে তিনজন খেয়েই চলেছে। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। অন্য দিন খেতে খেতে কত হাসি গল্প হয়। সেদিন মা-মেয়ের মনে মায়ার কথাই ঘুরে-ফিরে আঘাত দিতে লাগল। জয়া আই. এ. পরীক্ষার পর বম্বেতে তার নলিনী-কাকার বাড়ীতে কিছুকাল ছিল—সে সব কথা জয়ার মনশ্চক্ষে ফুটে উঠতে লাগল। তখন মায়ার নূতন বিয়ে হয়েছে। অমলেন্দুও এসেছেন শ্বশুর-বাড়ীতে। কতদিনের কত মান-অভিমান তার মনের ভিতর ভিড় করতে লাগল। পুরুষ এত সহজে ভুলে যায় কি ক'রে ? সবই কি তার ক্ষণিকের মোহ ? কেবল প্রবৃত্তি ? আর কিছু নেই ? কিন্তু মেয়েমানুষতো পারে না ভুলতে ? পারে বিশ্বাসঘাতকতা করতে ? হঠাৎ তার মনে পড়ল ইরা লীলা আইভি বেবীর কথা —এরা তো পর পর স্বামী ছেড়ে আবার বিয়ে করেছে। স্বামীর ভুলত্রুটী একদিনের জন্যেও ক্ষমা করে নি। স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত চাবুক দিয়ে চ'লে গেছে চিরদিনের জন্যে। একদিনের জন্যেও কাঁদে নি, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নি, নিজের অদৃষ্টকেও দোষ দেয় নি। বেশ করেছে। এ রকমই করা উচিত। মায়াদির উচিত—বিলেত থেকে এসে আবার বিয়ে করা।

গৃহিণী বললেন, "কি এত ভাবছিস, জয়া ? তোর হাতের ভাত যে হাতেই র'য়ে গেল, মুখে দে। মায়ার কথা ভেবে মন খারাপ ক'রে আর লাভ কি ? যা হবার তা হয়েছেই ?"

"ভাবছিলাম মা, মায়াদি এসে যদি বিয়ে করে, বেশ হয়। নয় মা?"

"সে মায়ার নিজের ইচ্ছে মা। তুই ওসব আর ভাবিস নে। খেয়ে ওঠ, রাত হোল।"

পরদিন সকাল আটটায় কল্যাণ এসে হাজির হোল। জয়া তখন খবরের কাগজ দেখছিল। কাগজটা টেবিলের উপর রেখে বললে, "কি খবর? সকালেই হাজির যে? অফিস নেই বুঝি?"

"অফিস আছে জয়াদি। একটা সুখবর পেয়েছি, তাই বিকেল পর্যন্ত থাকতে পারলাম না।"

"কি বল তো?"

"সেই যে মাসীমার পাঁচশ টাকা নিয়ে আমাদের কর্মীকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে?"

"নিশ্চয়ই আছে। এই তো কয়েক মাসের কথা?"

"ডাক্তার তাকে পরীক্ষা ক'রে রোগের কিছু পান নি। তবুও তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। আগামী মাসে ছেড়ে দেবেন। সে মস্ত এক চিঠি দিয়েছে আমাকে। তাতে তোমাদেরও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।"

জয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, "কল্যাণ, বাস্তবিকই খুব সুখবর। কাল থেকে একটা খারাপ সংবাদে মনটা ভালো লাগছিল না। যাই হোক, সুখবরটা শুনে অনেক আরাম পেলাম। ব'স তুমি, মাকে সংবাদটা দিয়ে আসি। মা খুব খুসী হবেন।"

জয়াকে আর মায়ের কাছে যেতে হোল না, নিজেই এসে মা হাজির হলেন। কল্যাণ বললে সব। তিনি খুব খুসী হলেন। বললেন, "বস কল্যাণ, একেবারে ছেলেদের সঙ্গে চারটি ভাত খেয়ে অফিস যেও। এখানেই চান কর। এখন আর মেসে যেতে হবে না। আমি এক কাপ চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

কল্যাণ বললে, "মাসীমা, চা আর দরকার নেই। এই মাত্র চা খেয়ে এসেছি।"

"তা হোক। জয়ার সঙ্গে গল্প কর।" তারপর জয়ার দিকে চেয়ে বললেন, "জয়া, ছাড়িস নে কল্যাণকে। ভাত খেয়ে যাবে।"

কল্যাণ বললে, "জয়াদি, আমি তো সুখবর দিলাম। তোমাদের খারাপ খবরটা কি বল তো?"

"বম্বেতে বাবার এক বাল্যবন্ধু নলিনী বোস থাকেন। উনি ওখানের অ্যাডভোকেট। ওঁর ছোট মেয়ে মায়ার স্বামী আবার বিয়ে করেছেন। মায়াদি বি. এ. পাস ছিলেন, এ ঘটনার পর আরো বেশি পড়তে বিলেত গেছেন। কাকিমা মেয়ের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে মারা গেছেন। কাল কাকাবাবু এসেছিলেন, সব তাঁরই কাছে শুনলাম।"

কল্যাণ বললে, "তোমার কাকাবাবু এখন কোথায় থাকেন?"

"থাকেন বম্বেতেই। কাকাবাবুর ছোট ভাই মণি বোস থাকেন কলকাতাতেই, সেখানেই উঠেছেন।"

দুঃখিত স্বরে কল্যাণ বললে, "সত্যিই খারাপ খবর। কি আর করা যাবে বল? তবুও উনি শিক্ষিতা মেয়ে—এই রক্ষে। নইলে আরও মুস্কিল হোত।"

এমন সময় বেযারা এসে জানালে—কর্তাবাবু দিদিমণিকে ডাকছেন।

"কল্যাণ, চল, বাবার সঙ্গে দেখা করবে। আমিও শুনে আসি, কেন ডাকছেন!"

কল্যাণ প্রণাম করতে রায়বাহাদুর খুসী মনে বললেন, "বেঁচে থাক বাবা, সুখী হও। ব'স বাবা, ব'স।" তারপর জয়ার দিকে চেযে বললেন, "একটা সুখবর আছে মা। সুশীল একটা ভালো চাকরী পেয়েছে। কাল অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার এসেছে। আজ সকালে সুশীল দেখালে।"

জয়া বললে, "মা জানেন বাবা?"

"জানেন তিনি। সুশীল কালই রাত্রে তাঁকে জানিয়েছে।"

জয়া ভাবলে, পরের দুঃখে মা চিরকালই অভিভূত হয়ে পড়েন। মায়াদির জন্যে এত ব্যাকুল হয়েছেন যে, এ সংবাদটা তাঁর মনে বিশেষ স্থান পায় নি।

কল্যাণ বললে, "ভালোই হোল মেসোমশায়। দু ভাই এখন চাকরী পেল, এবার আপনি অনেকটা নিশ্চিন্ত।"

"অনেকটা বটে, তবে পুরোটা নয়। জয়া-মার বিয়ে হ'লেই আমি একবারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারি। মরবার আগে মায়ের আমার একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে আমার আত্মার গতি হবে না কল্যাণ।"

কল্যাণ বললে, "নিশ্চয়ই জয়াদির বিয়ে হয়ে যাবে। আপনি সম্বন্ধ দেখুন। আপনার কথা জয়াদি নিশ্চয়ই শুনবেন।"

সরকার মশায় পূর্ব থেকেই সেখানে ছিলেন। তিনি বললেন, "জয়া-মা বিদুষী বুদ্ধিমতী গুণবতী, ওর বিয়ে খুব ভালোই হবে। আপনি ভাবছেন কেন ?"

"আমি হয়তো দেখে যেতে পারব না।"

"নিশ্চয়ই পারবেন। ভালো সম্বন্ধ পেলে মা আমার অমত করবে না।" ব'লে সরকার মশায় ও রায়বাহাদুর জয়ার মুখের ভাবটা চকিতে একবার দেখে নিলেন। জয়ার উদাসীন নির্বিকার মুখ দেখে তাঁরা কিছুই বুঝলেন না। ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন রেখাই তার মুখে ফুটে ওঠে নি।

কল্যাণ বললে, "জয়াদি, এবার অফিসের বেলা হোল।"

"হ্যাঁ ভাই, চল।" ব'লে রায়বাহাদুরের দিকে চেয়ে বললে, "বাবা, আনন্দের দিনে একটা জিনিস চাইব আমি, তোমায় দিতেই হবে।"

"নিশ্চয়ই দেবো। তোমায় অদেয় আমার কিছু নেই মা।"

"এটা অবশ্য আমি একবার চেয়েছিলাম, তুমিও দেবে বলেছিলে, আজ আবার আমি সেই পুরাতন চাওয়াকেই নূতন ক'রে—"

রায়বাহাদুর কন্যাকে আর কথা শেষ করতে দিলেন না, তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আর তোমায় বলতে হবে না। টিউবওয়েল তো? কাল থেকেই ব্যবস্থা করব। বুড়োমানুষ—ভুলে যাই, মনে থাকে না সব কথা। সরকার মশায়, মনে রাখবেন তো, কাল প্রথম কাজ মায়ের টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা।"

সরকার মশায় হেসে বললেন, "জয়া মা, কাল সকলেই তোমার বস্তিতে গিয়ে দেখে আসব কোথায় টিউবওয়েল হবে।"

"কাকাবাবু, মনে থাকে যেন।"

"নিশ্চয়ই মনে থাকবে।"

"এস কল্যাণ, আর দেরী নয়, খাবে এস।"

১৪

প্রায় পনের দিন হোল কল্যাণের দেখা নেই। ব্যাপার কি? কি হোল তার? আসছে না কেন? সেবক সমিতিতে ক'দিন যায় নি—দাদারা বললে। তবে অসুখ করল নাকি? ফোন ক'রে দেখা দরকার ওর অফিসে। জানলার ধারে ব'সে ভাবতে লাগল জয়া। এমন সময় মা এসে বললেন, "কি ভাবছিস জয়া এত? চারটে প্রায় বাজে। চা খাবি চল্। আজ উনি লেকের ধারে একটু বেড়াতে যাবেন বলছেন।"

মায়ের কথায় জয়া উৎফুল্ল হয়ে উঠল—"সত্যি মা, বাবা যাবেন আজ বেড়াতে? অনেক দিন বেরোন নি। যাচ্ছি মা চায়ের টেবিলে, তুমি যাও।"

রায়বাহাদুর লেকের ধারে, গড়ের মাঠে, আর নলিনী বোসের বাড়ীতে বেড়াতে যাবেন ঠিক করেছেন। ছেলেমেয়ের জন্যে মাসের পর মাস নিজেকে বন্দী রেখেছেন, প্রবল ইচ্ছে সত্ত্বেও কোথাও যান নি বেড়াতে। আমোদপ্রমোদে যোগ দেন নি, পাছে তাঁর অসুখ সেরে গেছে মনে ক'রে ছেলেমেয়েরা আবার টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়ায়! যাকগে বেড়ানো, নিজের প্রবল ইচ্ছেকে সবলে দমন করেছেন তিনি। বিগত যৌবনের সমৃদ্ধি আর সমারোহের দিনেও কত ইচ্ছা, কত আকাঙ্ক্ষা কেঁদে কেঁদে বিদায় নিয়েছে তাঁর জীবন থেকে, কখনও অস্থির হন নি।

কিন্তু আজ অধীর হয়েছেন আনন্দে। তাঁর অনিল আর সুশীল উপার্জন করতে আরম্ভ করেছে। এবার বৌ আসবে ঘরে, তারপর নাতি নাতনি। রিক্ত শূন্য জীবন তাঁর ভ'রে উঠবে। কচি কচি ফুলের মত মুখগুলি দেখে জীবনে সব ব্যর্থতা ভুলে যাবেন। এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিলে গাড়ী প্রস্তুত। দিবাস্বপ্ন তাঁর কেটে গেল। জয়া বললে, "বাবা, নলিন-কাকাকে আসতে বোলো।"

"দেখি মা কতদূর যেতে পারি। তার বাড়ী আবার সেই শ্যামবাজারে।"

সরকার মশায়কে নিয়ে গাড়ীতে উঠবেন, এমন সময় কল্যাণ এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল।

"মেসোমশায়, বেরোচ্ছেন? কেমন আছেন আজকাল?"

"আর আমাদের ভালো হবার আশা আছে নাকি? বয়েস হয়েছে, দিনের পর দিন মন্দের দিকেই যাচ্ছি। যাকগে ওসব কথা। তুমি ভালো আছ তো?"

"হ্যাঁ মেসোমশায়।"

"যাও কল্যাণ, বাড়ীর ভেতর।" ব'লে তিনি মোটরে উঠলেন। দরজার গোড়ায় জয়া দাঁড়িয়ে ছিল, বললে, "কি গো মশায়, ডুব মেরেছিলে এতদিন কোথায়? আমি তো ভেবে মরি—অসুখবিসুখ হোল নাকি?"

"জয়াদি, তুমি তো আর অবলা পরনির্ভরশীলা নও। নিলেই তো পারতে খোঁজটা—ম'রে গেছি কিংবা বেঁচে আছি!"

"এখন তো অবলাই হয়েছি ভাই। বাড়ীতে ব'সে যতটুকু খোঁজ করবার করেছি। জান তো বাইরে বেরোলে কত হাঙ্গাম করতে হয় আমার!"

"চল ভেতরে, চা খেতে খেতে কথা হবে।"

"অফিস-ফেরতা নাকি?"

"পনের দিনের ছুটী নিয়েছিলাম। একটা কাজের জন্যে।"

"বাবা! কি এমন কাজ?"

"ভীষণ কাজ ভাই জয়াদি। চল, সব কথাই বলতে এসেছি এখানে।"

চায়ে চুমুক দিয়ে কল্যাণ বললে, "এদিককার খবর কি? বল তো জয়াদি শুনি?"

"এদিককার খবর ভালোই। টিউবওয়েল বসানো হচ্ছে। ডাক্তার-কাকিমার টাকায় বস্তির ঘরগুলোও সারানো আরম্ভ হয়ে গেছে আর পায়খানাগুলোও তার সঙ্গে সারানো হচ্ছে। চাঁদা প্রায় চারশ টাকা উঠেছে। যা কম পড়বে, মা আর নলিনকাকা দেবেন বলেছেন।"

"বেশ বেশ, খুব সুখবর।"

"তোমার ব্যাপারটা বললে না? কেন তুমি পনের দিনের ছুটী নিয়েছ?"

"বলতেই এসেছি আজ। অনিল সুশীল আসুক, মাসীমা থাকবেন সামনে, বলব সব। সে এক উপন্যাসের কাহিনী।"

"তাই নাকি? উপন্যাসের নায়কটি কে, তুমি নাকি?"

"ভগবানের ইচ্ছে হ'লে হয়তো আমাকেই সাজতে হবে। দেখা যাক কি হয়?"

তারপর গৃহিণীর দিকে চেয়ে কল্যাণ বললে, "মাসীমা, এত খাবার খেতে পারব না। বাপ রে, সারা দুপুর বুঝি খাবারই হয়েছে?"

গৃহিণী বললেন, "সরকার মশায়ের মেয়ে মলিনা বড় গুণবতী। সে করেছে সব খাবার।"

"চেঞ্জে যাচ্ছেন কবে মাসীমা?"

"এবার যাব। পুজো তো এসে গেল। আমার বোনের একটা বাড়ী আছে রাজগীরে, চিঠি দিয়েছি তাকে,—যদি খালি পাই রাজগীরেই যাব। সাজানো গুছোনো বাড়ী—কোন হাঙ্গাম পোয়াতে হবে না। কেবল কাপড় নিয়ে গেলেই চলবে।"

শিঙাড়ায় কামড় দিয়ে বললে কল্যাণ, "খুব ভালো হবে। রাজগীর অতি চমৎকার জায়গা। দৃশ্যও অতি সুন্দর শুনেছি। তাছাড়া কাছেই নালন্দা।"

জয়া বললে, "মা, মলিনাদি যাবে না আমাদের সঙ্গে?"

"চিঠি দেব ওর শ্বশুর-বাড়ীতে। যদি মত হয় নিশ্চয় যাবে।"

এমন সময় অনিল এসে উপস্থিত। কল্যাণকে দেখে বললে, "কি হে, অনেক দিন পর? ডুব দিয়েছিলে কোথায়? অফিসে যাও না, মেসে গিয়েছিলাম একদিন, শুনলাম ঠিক সময়মত খেয়ে বেরিয়ে যাও। ব্যাপার কি?"

"হাত মুখ ধোও, চা খাও, বলতে যখন এসেছি, শুনবেই তো।"

গৃহিণী জয়াকে বললেন, "আমি যাচ্ছি ঠাকুর-ঘরে। আরতির সময় হয়ে এল। সুশীল এলে সকলকে চা ক'রে দিবি।"

জয়া ঘাড় নেড়ে জানালে, আচ্ছা।

গৃহিণী চ'লে যেতে জয়া বললে, "বাবার অসুখে আমারই মুস্কিল। সব সময় ঘরে ব'সে থাকতে হয়। বাবার কাজ খুবই সামান্য, বলতে গেলে কিছুই নয়। অথচ সব সময় চুপচাপ কি চার দেয়ালের ভেতর থাকা যায়? সমিতির কিছুই করতে পারি না।"

কল্যাণ বললে, "সব সময় সক্রিয়ভাবে কি করা যায় কাজ? টাকা দেবে, তোমার শুভ কামনা দেবে—তাতেই হোল।"

"টাকা আর দিচ্ছি কই? মা আর কত দেবেন? দাও না একটা চাকরী জুটিয়ে। এত বড় হয়েছি, এখন মা-বাপের কাছে হাত পাততে কি ভালো লাগে?"

"চাকরী কি তোমার পোষাবে? আর মেসোমশায় করতে দেবেন? এম. এ.তে ফার্স্ট ক্লাস ইংলিসে, এখুনি প্রফেসারি জুটে যাবে।"

"মা রাগ করবেন না, তবে বাবা রাগ করবেন।"

"রাগ করাই উচিত।"

"এ কথা কেন বলছ কল্যাণ?"

"তোমার একটা কর্তব্য আছে মাসীমা-মেসোমশায়ের ওপর। মেসোমশায়ের হার্টের অসুখ। কখন কি হয় বলা যায় না, আর তুমি যাবে দশটা পাঁচটা চাকরী করতে?"

"তাঁর ছেলেরা যে করছে?"

"তারা ছেলে, তাদের কাজই উপার্জন করা। আর তুমি মেয়ে, তোমার কাজ সংসার দেখা।"

তির্যক হেসে জয়া বললে, "তাই নাকি? তুমি যে এ রকম বলবে জানতাম না। এখনকার যুগে ছেলেমেয়ের কাজের তফাত আছে নাকি? এই বিংশ শতাব্দীতে ছেলে মেয়ে সব সমান—সমান অধিকার, সমান কাজ।"

ঘাড় নেড়ে কল্যাণ বললে, "তা হতেই পারে না। ছেলেমেয়েকে তফাত ক'রেই পাঠিয়েছেন ভগবান পৃথিবীতে; তাদের শরীর এবং মনের গঠন অন্য রকম করেছেন, আর সেই জন্যে কাজের ভাগও ক'রে দিয়েছেন।"

জয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, "কাজের ভাগ ভগবান করেন নি, করেছ তোমরা। যাতে মেয়েরা পুরুষের পায়ের তলায় চিরকাল থাকতে পারে, তার জন্যেই তাদের উপার্জনক্ষমতা লোপ ক'রে, বাড়ীর ভিতর কাজের চাপে পিষে মারবার ব্যবস্থা করেছ। তাদের মূর্খ রেখে ভালো মন্দ বুঝবার ক্ষমতাও লোপ ক'রে দিয়েছ।"

"আচ্ছা জয়াদি, তোমার অভিযোগ না হয় স্বীকার করলাম। কিন্তু এই যে নারীর অধিকার নিয়ে আলোড়ন চলছে, তাতে তোমাদের কে বেশী সাহায্য করেছে?"

"সাহায্য বেশী পুরুষই করছে, কিন্তু আগেই তো বললাম—মেয়েদের ভালো মন্দ বুঝবার ক্ষমতাই লোপ পেয়ে গেছে।"

"তা তো পেয়েছেই—স্বীকার করছি, এবং এর জন্যে দায়ী পুরুষরাই—তাও মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এরাই আবার মেয়েদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার জন্যে ব্যস্ত কেন?"

"ক'জন ব্যস্ত? আঙুলে গোনা যায়। মেয়েদের শিক্ষা দিলে তারা কি পুরুষের সঙ্গে সমানে জলে স্থলে আকাশে পাল্লা দিতে পারে না?"

"সবাই না পারুক কিছু কিছু পারে, দেখতেই তো পাচ্ছি। তবে পাল্লা দেওয়াটাই তো বড় কথা নয়। মেয়েদের সামাজিক সমান অধিকার হওয়া

উচিত—এটা আমি মনেপ্রাণে সমর্থন করি, কিন্তু কর্মজীবন পাশাপাশি—এ আমি সমর্থন করি না। মেয়েরা ঘর-সংসার করুক, নিজের সন্তানকে সুশিক্ষায় মানুষ ক'রে তুলুক যাতে দেশের উপকার হয়। এক-একটি সুশিক্ষিত ছেলে দেশের সম্পদ—এরাই অমঙ্গল থেকে দেশ আর জাতিকে বাঁচাতে পারে। মা হওয়ার মতো বড় সাধনা আর নেই জয়াদি। তবে এই আর্থিক বিপর্যয়ের দিনে ঘর-সংসার সামলে যদি কিছু উপায় করা যায় মন্দ নয়।"

অনিল হাত মুখ ধুয়ে এসে ওদের কথা শুনছিল, আর সুশীলও এসে পড়েছে। জয়া ব্যস্ত হয়ে বললে, "বড়দা কখন থেকে ব'সে আছে, ছোটদাও এসে পড়েছে, কথাতে মত্ত ছিলাম, যাই, আমি চা নিয়ে আসি।"

সুশীল চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, "কল্যাণ, বহুদিন তোমার খবর নেই, কি করছিলে এতদিন? আস নি কেন?"

"তাই বলতেই তো এসেছি। মাসীমা আসুন বলব।" সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণী এসে দাঁড়ালেন। কল্যাণ বললে, "মাসীমা, আপনি কি একটু বসতে পারবেন?"

"হ্যাঁ বাবা বসছি, বল তোমার কি কথা!"

"মাসীমা দিন ষোল আগে আমি শিয়ালদা স্টেশনে একটা কাজে গিয়েছিলাম। সে সময় একটি উদ্বাস্তু বৃদ্ধা মারা গেছেন। তার মাথার কাছে ব'সে কুড়ি-একুশ বছরের একটি মেয়ে আর দশ-বারো বছরের একটি ছেলে হাপুস নয়নে কাঁদছে। চারদিকে অন্য উদ্বাস্তুরা ঘিরে তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছে। দেখে আমার বড় মায়া হলো। তখুনি আমি সৎকার-সমিতিতে খবর দিয়ে মড়া পোড়াবার ব্যবস্থা করি। অন্য উদ্বাস্তুদের বলি, তোমরা ঐ ভাই-বোনটিকে আজকের রাতের মতো দেখো। কাল এসে আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা করব। পরদিন বিকেলে অফিস-ফেরতা ওখানে যাই। তাদের জিগ্যেস করি, কোন ক্যাম্পে যেতে চায় নাকি? তারা কিছুতেই রাজি নয়। আমারও ইচ্ছে নয় ক্যাম্পে পাঠানো। আমি ওদের কি

করব, কোথায় রাখব এই রকম যখন সাত-পাঁচ ভাবছি, তখন ঐ দলেরই একটি মাতব্বর লোক একটু আড়ালে আমায় ডেকে বললে—'ওর মা বেশ্যা ছিল, ঐ মেয়েটিও ঐ ব্যবসা করছিল। তারপর সব হিন্দু চ'লে আসতে আর ওদের পাকিস্তানে থাকবার সুবিধে রইল না! আপনি ভাবেন কেন, ওদের ব্যবস্থা ওরাই ক'রে নেবে।' মুস্কিলে পড়লাম মাসীমা। কদিন অফিস ছুটি নিয়ে মেয়েদের বোর্ডিং আশ্রম ঘুরে দেখলাম ওদের রাখতে পারি কি না, কিন্তু কেউ চায় না নিতে জন্মের ইতিহাস শুনে। ভেবেছিলাম ওদের জন্ম কর্ম সব গোপন করব; কিন্তু সাহস হোল না। প্রকাশ পেলে আরও মুস্কিল। কি করি মাসীমা, বলুন তো?"

গৃহিণী একটু চিন্তা ক'রে বললেন, "এখানেই না হয় আন।"

"তা হয় না মাসীমা। মেসোমশায়ের অসুখ, তারপর আপনারা চেঞ্জে চ'লে যাচ্ছেন, ওকে নিয়ে আর এক ফ্যাসাদে পড়বেন। চিরদিন আপনার ঝঞ্ঝাট বইতে বইতে জীবন গেল।"

অনিল বললে, "তোর তাহ'লে ওদের চিন্তায় চোখে ঘুম নেই, মুখে আহার নেই, কি বল্?"

গৃহিণী বললেন, "যাদের চোখ খোলা থাকে সবার দিকে, তাদের চোখে ঘুম কোনদিনই থাকে না। কল্যাণ, তুমি ইতস্তত না ক'রে কালই ওদের আমার কাছে আন।"

কল্যাণ বললে, "মাসীমা, একটা কথা ভেবেছি—যদি কিছু না মনে করেন তো বলি।"

"স্বচ্ছন্দে বল। কোন ভাবনা নেই তোমার।"

"অনেক চিন্তা করেছি ওদের আশ্রয়ের; কিন্তু কিছু উপায় দেখলাম না। আর শুধু আশ্রয় দিলেই তো হোল না, বাঁচার একটা ব্যবস্থাও করা দরকার। তাই ভাবছি আমিই না হয় মেয়েটিকে বিয়ে করি। বাবা অবশ্য রাগ করবেন; কিন্তু তাছাড়া উপায় কি? চোখে যখন পড়েছে, ভাসিয়ে দিতে পারি না তো?"

অনিল বললে, "ভাসিয়ে দিতে পারবি না, তাই নিজেও ভাসতে চাস ওদের সঙ্গে ?"

গৃহিণী দৃঢ় স্বরে বললেন, "অসম্ভব কল্যাণ, বিয়ে করা ওকে চলে না বাবা। ওকে আশ্রয় দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ কর—তাতে আপত্তি নেই ; কিন্তু বিয়ে অন্য ব্যাপার। ও মতলব ছাড়। তুমি কালই আমার কাছে আন, কোন চিন্তা করতে হবে না তোমার। আমিই ওদের মানুষ ক'রে দেব। আপাতত আমাদের সঙ্গে চেঞ্জে চলুক। তারপর নূতন বছরে ছেলেটিকে ভর্তি ক'রে দেব। মেয়েটিকে আমরা যখন ফিরব স্কুলে দেব। ততদিন জয়ার কাছে লেখাপড়া শিখুক ভাইবোনে।"

"সে কি মাসীমা ? মেসোমশায় রাগ করবেন, তাঁর উত্তেজনা হবে—হঠাৎ যদি অসুখ বেড়ে যায় ?"

"সে ভয় নেই তোমার। সব ভার আমি নিচ্ছি। তুমি আমার ওপর ওদের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। কালই নিয়ে এস ।"

১৪

রায়বাহাদুর ফিরে এলেন রাত্রি প্রায় নটায়। খুশীতে উচ্ছ্বসিত মন। সন্তোষ ডাক্তার আর নলিনীবাবু দুই বন্ধুর বাড়ীতেই গিয়েছিলেন। তাঁরাও চেঞ্জে যেতে রাজি হয়েছেন তাঁর সঙ্গে। রাজগীরে বেশ আরামে গল্পগুজবেই কাটবে।

জয়া বললে, "বেশ ভালো হবে বাবা। মলিনাদির শ্বশুরবাড়ীতে লিখে দাও আর দু-তিন মাসের ওকে ছুটি দিতে।"

রায়বাহাদুর বললেন, "সরকার মশায় লিখেছেন. জবাব আসবার এখনও সময় হয় নি।" তারপর উৎফুল্ল স্বরে বললেন, "সরকার মশায়, আমার রঘুনাথ বাড়ীতে আসতেই সুশীলের চাকরী হোল। আমি ভালো ক'রে রঘুনাথের

সোনার মুকুট গড়িয়ে দেব। আর জয়ার আমার ভালো বিয়ে হ'লে তাঁকে সোনার সিংহাসনে রাখব।"

জয়া বললে, "ছোটদার যদি চাকরী না হোত তা হ'লে কি তুমি তাঁকে রূপোর সিংহাসন থেকে টেনে নাবিয়ে দিতে?"

"ছিঃ ছিঃ!" যুক্ত কর স্পর্শ ক'রে বললেন গৃহস্বামী, "তুই যে কখন কি বলিস তার ঠিক নেই। যিনি শত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর, তাঁকে আমরা কি দিতে পারি? তবে আমরা সংসারী মানুষ, আমাদের আনন্দ প্রকাশের ধারাই ঐরকম। ধর্, যিনি আমাদের ফুল দিয়েছেন, তাঁকে আমরা সেই ফুল দিয়েই পূজা করি।"

জয়া বললে, "আমার মনে হয় দরিদ্রনারায়ণের সেবা করলেই রঘুনাথ বেশী খুসী হবেন।"

"তা হবেন। তবে ভক্তেরও ইচ্ছে হয় ভগবানকে সাজাতে।"

জয়া ভাবলে, স্বার্থান্ধ মানুষ কজনই বা ভগবানের ভক্ত? কিন্তু কোনও উত্তর দেওয়া সমীচীন নয় মনে ক'রে নীরব থাকল সে।

পরদিন অনিল আর সুশীল কল্যাণের অফিসে গিয়ে হাজির হোল। অনিল ঠাট্টা ক'রে বললে, "কি গো কল্যাণবাবু, আজ যাবে তো তাদের নিয়ে আমাদের বাড়ীতে, না, বিয়ের মতলব মাথায় এখনও ঘুরছে?"

অনিল বললে, "এক দুঃস্থ মেয়েকে নিয়ে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, চুপ করলাম। স্টেশন থেকে ওদের নিয়ে যেতে মা হুকুম দিয়েছেন।"

কল্যাণ টেবিলটা গুছিয়ে বললে, "চা খাবি?"

"না না, আর চায়ে দরকার নেই। পাঁচটা বেজে গেছে। চল্ শিগ্গীর।"

স্টেশনে এসে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল, যে জায়গায় তারা থাকত সে জায়গাতে তো নেই! কোথায় গেল? আশেপাশের লোকগুলোকে জিগ্যেস

করলে ওরা। তারা বললে, "বলেইছিলাম আমরা—ওরা খারাপ মেয়েমানুষ, যাবে না আপনাদের সঙ্গে। কদিন থেকেই এক বাবু প্রকাণ্ড মোটর নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। সেই বাবুটির সঙ্গেই আজ সকালে চ'লে গেছে। তখন বলেছিলাম—ওদের বিশ্বাস করবেন না, জাতসাপের বাচ্চা ওরা।"

তিনজনেই কয়েক মিনিট বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অনিল বললে, "চল, এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? যে জলের জীব ওর সেই জলেই গেছে।"

কল্যাণ বললে, "কে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে হয়তো সব কেড়ে-কুড়ে ছেড়ে দেবে পথের মাঝে।"

"তাই যদি হয় তুই কি করতে পারিস? চল্, মা ব'সে আছেন আমাদের পথ চেয়ে।"

গৃহিণী সব শুনে বললেন, "কি আর করবে বল? তুমি ওদের ভালোর জন্যে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে কত চেষ্টা করলে। এখন মন খারাপ ক'রে কি ফল হবে?"

কয়েক দিনের মধ্যেই রাজগীর থেকে চিঠি এল—বাড়ী খালিই আছে, রায়বাহাদুর যেন অতি অবশ্য সেখানে হাওয়া বদলাতে যান। মলিনার শ্বশুরও অনুমতি দিয়ে পত্র দিয়েছেন। যাবার তোড়জোড় হতে লাগল। জয়া কয়েক দিন সমিতিতে গিয়ে নূতন সেক্রেটারীকে সব বুঝিয়ে দিলে। সমিতির প্রেসিডেণ্ট বললেন, "কত দিন হবে ফিরতে?"

"ঠিক বলতে পারি নে। বাবার যা অবস্থা। একটু না সারলে কি ক'রে ফেরা যায়?"

"এখানে মাঝে মাঝে আসতেই হবে তোমাকে। সমিতির কাজের জন্যে, আর একজন তো রইলেন তাঁর জন্যেও।"

জয়া বুঝতে পারলে না, বললে, "কার জন্যে?"

"বুঝতে পারলে না? ন্যাকা হয়েছ খুব। ভিজে বেড়াল—ভাজা মাছ উল্টে খেতে জান না?"

"তুমি যা খুসী বলতে পার বেলাদি। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না, কাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলছ কথাগুলো।"

"তোমার স্নেহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান কল্যাণ।"

"ওঃ, কল্যাণের কথা বলছ? শুধু কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ও তো রইল এখানে। আসব বৈকি সবার জন্যে মাঝে মাঝে।" ব'লে হেসে সমিতির ফাইলের চিঠিগুলো পড়তে লাগল।

যাবার দিন এসে পড়ল। বস্তির যত গরীব-দুঃখী তাদের দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে এলো। যাবার সময় সকলে বার বার অনুরোধ করতে লাগল তাড়াতাড়ি চ'লে আসবার জন্যে। জয়া বললে তাদের, "তোমরা ভালো ভাবে থেকো। ঝগড়াঝাটি ক'রো না। বস্তি বেশ পরিষ্কার রাখবে। অনেক ক'রে তোমাদের কল-পায়খানা হয়েছে। সবাই লক্ষ্য রাখবে। মিলে মিশে এক হয়ে থাকবে। কিছু অভাব হ'লে আমার এই সরকার-কাকাকে ব'লো। কল্যাণ, দাদাবাবু আর দাদারা যাবে মাঝে মাঝে তোমাদের বস্তিতে।" পুরুষদের বললে জয়া, "খবরদার, নেশা করবে না, আর বউদের গায়ে হাত দেবে না।"

সরকার মশায় বললেন, "তুমি লোকগুলোকে লেলিয়ে দিলে আমার দিকে? এখন রোজ এসে জ্বালাতন করবে—এ নেই সে নেই ব'লে।"

জয়া হেসে বললে, "ভয় নেই কাকা। ওরা শুধু শুধু বলবে না। ওরা এখন অনেক ভালো হয়েছে।"

"তা না হয় হোল, কিন্তু ওদের তো নিত্য অভাব লেগেই আছে।"

"তা সত্যি, তবে খুব অল্পে সন্তুষ্ট ওরা। আপনি না হয় রঘুনাথের বরাদ্দ কমিয়ে ওদের কিছু কিছু দেবেন।"

সরকার মশায় জিভ কেটে কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে বললেন, "ছিঃ ছিঃ মা, বলতে আছে ও-রকম কথা ? ওতে যে অপরাধ হবে ।"

"কিছু অপরাধ হবে না কাকাবাবু। ওদের সেবা করলেই রঘুনাথের সেবা করা হয় । ঈশ্বর যে সবহারাদের মধ্যেই বেশী ক'রে ঘুরে বেড়ান ।"

১৫

রাজগীরে পৌঁছলেন রায়বাহাদুর সদলবলে। স্টেশনের কাছেই পাহাড়ের কোলে সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী। সামনে ফুলের বাগান। ভোর থেকে বেলা প্রায় নটা দশটা পর্যন্ত বিহারী পুরুষ মেয়ে তরিতরকারী মাংস দুধ নিয়ে বাজারে বিক্রী করতে যায়। চেঞ্জাররা বেড়াতে যান—তাঁদের হাসিগল্পে রাস্তা মুখরিত হয়ে ওঠে।

ভাদ্র মাস। মাত্র আর এক মাস পরেই পূজো। সকলের মন পুলকে বিভোর। সারাবছর ধ'রে বাঙালী দিন গোনে এই সময়ের জন্যে। দীন দরিদ্র, দুঃখী ধনী সকলেরই মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের হিল্লোল ব'য়ে যাচ্ছে। মাত্র তিন দিনের জন্যে আনন্দময়ী মা আসছেন এই নিরানন্দ দেশে, তাই সকলেরই মনে আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেছে।

খুব ভোরে সবাই বেড়াতে যান, যায় না কেবল জয়া। তার ভালো লাগে বাগানে ইজিচেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকতে। বৌদ্ধসম্রাট অজাতশত্রুর রাজধানী রাজগৃহ যে এত সুন্দর তা জানত না জয়া। পঞ্চপর্বত-বেষ্টিত সুন্দর এই ছোট্ট শহর। চারদিকেই আকাশের পটে অনন্তপ্রসারিত পর্বততরঙ্গমালা। সে শিলং দার্জিলিং দেখেছে, হিমালয়ের শুভ্র তুষারাচ্ছাদিত পর্বততরঙ্গমালার উপর সূর্যকিরণে যে মায়াপুরী রচনা করে তাও তার অদেখা নয়, তরুণ এবং অস্তগামী সূর্যের লোহিত আভায় আভাময় পর্বতরাজির অপরূপ রূপে সে আত্মহারা হয়েছে। সে আরও দেখেছে পর্বতের উপর মেঘ কুয়াশা আর সূর্যকিরণের অপরূপ মিতালি। বিভ্রম সৃষ্টি

করে, বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে মন। এখানে তুষারও নেই, মেঘ-কুয়াশার খেলাও নেই; কিন্তু তবুও দিগন্তের কোলে অনন্তপ্রসারিত পর্বতমালার শান্ত সমাহিত ভাব মনকে প্রশান্তিতে ডুবিয়ে দেয়।

গৃহিণী বললেন, "চেঞ্জে এসে বেড়াতে যেতে চাস না কেন? সকাল সন্ধ্যে চ'লে ফিরে বেড়াবি, তবে তো শরীর মন দুই-ই ভালো থাকবে।"

ডাক্তার-গৃহিণী বললেন, "তাই তো, সকাল-সন্ধ্যে ফাঁকা জায়গায় ঝিরঝিরে হাওয়ায় বেড়ালে শরীরের সব গ্লানি কেটে যায়। এখানে তোমার একা একা ব'সে থাকতে ভালো লাগে জয়া?"

"ভালো লাগে ব'লেই তো বসি কাকিমা। সামনের দিকে চেয়ে চুপচাপ ব'সে থাকতে আমার খুব ভালো লাগে। তাছাড়া এসে পড়েছি যখন, থাকতে হবে হয়তো অনেক দিন, বেড়াতে তো যেতেই হবে। ইচ্ছে করলেই বেড়াতে যাব।"

কাকিমা বললেন, "যখন বেড়াতে ইচ্ছে হবে, তখন না হয় যাবে। কিন্তু কুণ্ডুতে চান করতে যাও না কেন? এখানে আসেই মানুষ চান করতে। দু বেলা না পার, এক বেলা ক'রো।"

"তা আমি কোনদিনই পারব না কাকিমা। ধাক্কাধাক্কি ধস্তাধস্তি ক'রে কে চান করবে? তাছাড়া কুণ্ডু—! মাগো, সে তো অসম্ভব নোংরা জল! ছেলেমেয়ে একসঙ্গে চান এক বীভৎস কাণ্ড!"

"কুণ্ডুতে না গেলে, কিন্তু ঝরণায় তো যেতে পার। সেখানে তো শুধু মেয়েরাই করে।"

ঠোঁট উলটিয়ে জয়া বললে, "করুক গে, আমি পারব না অত ভীড়ে চান করতে।"

শুধু কি জয়া ভয় পেয়েছে চান করতে? রায়বাহাদুরও ভীড় দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বললেন বন্ধুকে, "ওহে ডাক্তার, এখানে চান করা আমার দ্বারা হবে না। এ যেন ভাঙা কাঁটালে মাছি পড়েছে হে। কিছু দেখা যায় না—কেবল কালো কতকগুলো মাথা।"

সন্তোষ ডাক্তার হেসে বললেন, "রায়বাহাদুরের ঝানু মাথা ওরই মধ্যে এক ফাঁকে গলিয়ে দাও, ব্যস, ঠিক হয়ে যাবে। তারপর একটু বোলচাল আর একটু কৌশল, বুঝলে হে—"

কয়েক দিন পরে ডাক্তারের কথাই ঠিক হোল। বোলচালে আর কৌশলে রায়বাহাদুরই হয়ে উঠলেন ওস্তাদ। প্রতিদ্বন্দ্বী স্নানার্থীদের অনবরত বোঝাতেন—তিনি বাতে পঙ্গু, তার উপর বৃদ্ধ, একটু দয়া ক'রে তাঁকে যেন জায়গা দেওয়া হয়, ইত্যাদি। তারপর ঝরণার তলায় বসলে এক ঘণ্টার কম কিছুতেই উঠতেন না। তা যত ধাক্কাধাক্কি আর যত গালাগালিই হোক না কেন।

দিন পনেরো পর রায়বাহাদুর লক্ষ্য করলেন তাঁদের বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড বাড়ীটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। বাগানটারও জঞ্জাল আগাছা জঙ্গল কাটা হচ্ছে। রায়বাহাদুর দরোয়ানকে জিগ্যেস করলেন, "ব্যাপার কি ?"

দরোয়ান বললে, "নলহাটির জমিদারের বাড়ী এটি। তাঁরা খবর দিয়েছেন দু-একদিনের মধ্যেই এসে পড়বেন।"

দরোয়ানের কথা শুনে তিন বন্ধুই খুসী হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, সামনের বাড়ীতে লোক এলো,—গল্পগুজবে কাটবে ভালো।

জয়া তাঁদের উচ্ছ্বসিত ভাব দেখে বললে, "তাঁরা জমিদার বড়লোক। আমাদের সঙ্গে মিশবেন কেন ? মাত্র বড়লোক হ'লেও বা কথা ছিল, জমিদার, ওরে বাবা !" ব'লে নাক মুখ কুঞ্চিত ক'রে ব'সে রইল।

মলিনা বললে, "মিশবে না কেন ? ওঁরাও বড়লোক আর তোমরাও বড়লোক জয়াদি।"

জয়া বললে, "কার সঙ্গে কার তুলনা কর। জমিদারের সঙ্গে আমাদের ? তোমার কোন আইডিয়া নেই মলিনাদি।"

ডাক্তার আর তাঁর গৃহিণী সেখানেই ছিলেন। জয়ার কথা শুনে তিনি বললেন, "ভয় পাচ্ছ কেন জয়া ? যদি ভালো ক'রে জমিদার-গিন্নীকে পটাতে পার, তবে তোমাদের সমিতির অনেক কিছু ক'রে নিতে পারবে।"

"তা হয় না কাকিমা। শুধু বড়লোক হ'লেও বা ভরসা ছিল, জমিদার বড়লোক—বড্ড হিসেবী।"

"কে বললে তোমায়? ওসব তোমার একবারে ভুল ধারণা।"

ডাক্তার হেসে বললেন, "কপাল যদি খোলে আমিও ওঁদের বাঁধা ডাক্তার হয়ে যেতে পারি, কি বল মা জয়া?"

"কি জানি!" ব'লে জয়া বিরক্তভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

তিন-চার দিন পরেই জমিদাররা তিন ভাই, দুই বৌরাণী, জমিদার-মাতা, নাতি, নাতনি, বিস্তর দাসদাসী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মোসাহেবের দল এসে পড়লেন। বাড়ীটা গমগম করতে লাগল। পাড়াটাও মুখরিত হয়ে উঠল। শুধু কি মানুষ? সাত দিন ধ'রে জিনিসপত্তরও যা এলো তা দেখবার মতো। গ্রামোফোন, হারমোনিয়াম, তবলা, অরগ্যান, সেতার, এস্রাজ, জলতরঙ্গ, বন্দুক, কুকুর, পাখী, খরগোস, গিনিপিগ, এমনি সখের জিনিস আরও কত কি!

নলিনী বোস বললেন বন্ধুদের, "জমিদার মশায়ের শিকারের সখ, মেজোর খেলা-ধুলার, আর ছোটর গান-বাজনার।"

ডাক্তার বললেন, "তুমি কি ক'রে জানলে?"

"আমি জিগ্যেস করেছিলাম দরোয়ানকে।"

রায়বাহাদুর বললেন, "ভালোই। বড়লোকের সময় কাটানো চাই তো। অন্য ভাবে সময় না কাটিয়ে খেলা-ধুলোয় কাটানো ভালোই, কি বল?"

নলিনী বোস বললেন, "নিশ্চয়ই।"

"ওঁরা একটু গুছিয়ে ব'সে নিন, তারপর আলাপ ক'রে আসব।"

ডাক্তার বললেন, "খুব ভালো প্রস্তাব। বাগিয়ে যদি নিতে পারি, ওদের ডাক্তারও হতে পারি, কি বল?"

রায়বাহাদুর বললেন, "কার কি সুবিধে হয় তা কি বলা যায়?"

মলিনা, গৃহিণী, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী—সকলের ইচ্ছে জমিদার-বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করা, কারণ তাহ'লে দিনগুলো কেটে যাবে গল্পগুজবে। আবার ভয়ও হয় যদি অহঙ্কারে মুখ বেঁকিয়ে নেয়।

মলিনা বললে, "জয়াদি, ওদের সঙ্গে তোমার আলাপ করতে ইচ্ছা হয় না?"

"একটুও না।"

"কেন জয়াদি?"

"ওদের চাল-চলন, কথাবার্তার সঙ্গে আমার খাপ খাবে না।"

"জয়াদি, তুমি বস্তির লোকের সঙ্গে মেলামেশা কর আর এঁদের সঙ্গে পারবে না?"

"না, তা পারব না, আর কেন পারব না তা তুমি বুঝবে না ভাই। তোমরা যাও না, আলাপ ক'রে এসো। আমাকে নিয়ে টানাটানি কর কেন?"

জমিদার-বাড়ীর গেটের এক ধারে সারি সারি ডুলী আর পাল্কী। ব্যাপার কি? পাল্কী আর ডুলী এঁরা কি মাসে ভাড়া দিয়ে রেখেছেন? কিংবা কিনে ফেললেন? খবর নিয়ে জানতে পারা গেল, ছেলেরা স্নানে কিংবা এখান সেখান যাবেন পাল্কীতে আর মেয়েরা ডুলীতে। হাঁটার তো অভ্যেস নেই ওঁদের।

একদিন সন্ধ্যেবেলা তিন বন্ধু বেড়াতে গেলেন জমিদার-বাড়ী। জমিদার আর তাঁর ভ্রাতারা অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাঁদের। বড় হলঘরে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে মজলিস বসে। হলঘরের দু পাশে বড় বড় দুটি কামরা। জমিদারের দুই ভ্রাতা দুই কামরায় তাদের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমায়। জমিদার মশায় খেলতে ভালবাসেন। কাজেই হলঘরে তাস, পাশা, পিংপিং দাবা সব রকম খেলার সরঞ্জাম। ছোটর ঘরে প্রতি সন্ধ্যে গানের আসর, মেজো খেলোয়াড় ভালো, কাজেই তাঁর ঘরে ঐ সব আলোচনাই বেশী। বৈঠকখানা একেবারে গুলজার। রায়বাহাদুররা ফিরে এসে ওঁদের

নিরহঙ্কার ব্যবহারের শতমুখে প্রশংসা করতে লাগলেন। ওঁদের আভিজাত্য আর সম্পদের কথাও বারে বারে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন। জয়া কাছে ব'সে সব শুনছিল। নিজেকে সে দমন করতে না পেরে বললে, "আচ্ছা বাবা, তোমরা যেচে ঘর ব'য়ে আলাপ করতে গিয়েছিলে, তাই যত্ন করেছেন বা দুটো কথা বলেছেন। এতেই এত আনন্দ তোমাদের? বড়লোক ব'লেই বোধ হয়। গরীব দুঃখী ওর শতগুণ বেশী করলেও এত খুসী হও না। টিউবওয়েল করবার সময় তুমি গিয়েছিলে বস্তিতে তারা কি তোমার আদর যত্ন কম করেছে? পায়ে তোমার কাদা লেগেছিল তাই তারা ধুইয়ে আঁচল দিয়ে মুছে দিয়েছে। তখন তো এত খুসী হও নি?" হাসতে হাসতে বললে, "বোধ হয় গরীব ব'লেই। গরীব তো মোছাবেই বড়লোকদের পা, এর মধ্যে বিশেষত্ব কি আছে?—বোধ হয় এ কথাই ভাবলে তুমি!"

রায়বাহাদুর গর্জন ক'রে উঠলেন, "তুই ভাবিস, বড় বড় বুলি আওড়ালেই মস্ত একটা মানুষ হওয়া যায়, না? জমিদারদের মন্দ দেখাই তোদের স্বভাব। চাষীদের ক্ষেপাতে হ'লে আগে জমিদারদের গালাগালি দেওয়া দরকার। ঐ একটি সস্তা কৌশলই তোরা মনে রেখেছিস। পৃথিবীতে বড় ছোট কেউ থাকবে না, এও কি সম্ভব ডাক্তার? স্বয়ং ঈশ্বরই সকলকে সমান বিত্ত দেন নি। তোমরা চেঁচালে কি হবে?"

ডাক্তারবাবু বন্ধুকে নিরস্ত ক'রে বললেন, "থাক্ ভাই থাক্। জয়া-মা ছেলেমানুষ, তার কথায় উত্তেজিত হতে আছে?"

১৬

রায়বাহাদুর ডাক্তারের কথা কানেই দিলেন না। নিজের কথার জের টেনে বলতে লাগলেন, "এ হতেই পারে না। সবাই সমান হবে—উঁচু নিচু থাকবে না, এ পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি? পাগলরাই এসব কথা ব'লে থাকে।"

জয়া রুষ্ট স্বরে বললে, "কেন হবে না? রাশিয়ার কি হচ্ছে?"

"রাশিয়া রাশিয়া ক'রো না শুধু শুধু। কি জান তুমি রাশিয়ার বিষয়ে? ওসব প্রোপাগাণ্ডা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

ইচ্ছে করলে জয়া এর উত্তরে অনেক কিছু বলতে পারত, কিন্তু শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে লাভ কি? ধৈর্য হারিয়ে যে কথা সে পিতার মুখের উপর বলেছে, তার জন্যেই সে দুঃখিত।

আবহাওয়াটা হাল্কা করবার উদ্দেশ্যে নলিনীবাবু বললেন, "মা জয়া, এ বুড়ো ছেলেদের এক কাপ ক'রে কফি খাওয়াতে হবে।"

"যাচ্ছি কাকাবাবু।" ব'লে জয়া উঠে গেল।

রায়বাহাদুর বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন, "আজকাল ছেলেমেয়েগুলোর কি হয়েছে—কথায় কথায় কেবল রাশিয়া রাশিয়া! আরে, এটা ভারতবর্ষ, এখানে ব'সে রাশিয়ার স্বপ্ন দেখলে কিছু হবে? স্বপ্ন কোনদিন সফল হবে না। স্বপ্নই থেকে যাবে।"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "বন্ধু, তোমার কথা ঠিক নয়। মাত্র তিন বছরে চীনের কি অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে বল তো? এ কথা তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না। যাঁরা দেখে এসেছেন চীন রাশিয়া, তাঁরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছেন। কাজেই তোমার এতে রাগ করবার কিছু নেই।"

পাছে পুনরায় রায়বাহাদুর উত্তেজিত হয়ে পড়েন এই ভয়ে নলিনীবাবু বললেন, "থাক্‌গে ওসব কথা। ডাক্তার, জমিদার-বাড়ীর সঙ্গে আলাপ হতে বড্ড খুসী লাগছে আমার। রোজ-যাওয়া যাবে সন্ধ্যেবেলা। সব রকম ব্যবস্থা আছে, যা ইচ্ছে হয় তাই করা যাবে।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "রোজ যাওয়া ওঁরা কি পছন্দ করবেন?"

"নিশ্চয়ই করবেন, বিদেশে লোক পছন্দ করবেন না, এও কি হতে পারে?"

"ওঁদের তো আর লোকের অভাব নেই।"

"তা হোক, তবু বাইরের লোক পছন্দ করবেন।"

এমন সময় জয়া তিন কাপ কফি দিয়ে চ'লে গেল সেখান থেকে।

সত্যিই জমিদার আর তাঁর দু ভাই খুব পছন্দ করলেন এঁদের। শুধু পছন্দ নয়, সন্ধ্যের সময় যেতে একটু দেরী হ'লে দরোয়ানকে পাঠিয়ে দিতেন ডাকতে। বিকেলের দিকে কোন কোন দিন জমিদার আর তাঁর ভাইরাও বেড়াতে আসতেন। তিন বন্ধুর বেশ ভাব হয়ে গেল ওঁদের সঙ্গে। ডাক্তার-গৃহিণী, মলিনা, গৃহিণী সকলেরই খুব ইচ্ছে জমিদার-বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবার, কিন্তু যেচে গিয়ে আলাপ করতে বাধ বাধ ঠেকছিল। যদিও রায়বাহাদুর প্রচুর উৎসাহ দিচ্ছিলেন তাঁদের, তবুও কুণ্ঠা ভাব ওঁদের কিছুতেই কাটছিল না। একদিন অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে পড়ল। সাধারণত রায়বাহাদুরের পরিবারের সকলেই চা খেয়ে বেড়াতে যেতেন, ফিরতেন স্নান সেরে একেবারে বেলা বারোটায়। এগারটার কিংবা সাড়ে এগারটার সময় চাকর সকলের কাপড় তোয়ালে নিয়ে হাজির থাকত কুণ্ডুতে। কয়েক দিন থেকে জয়াও যেতে আরম্ভ করেছে। তবে জয়া চান করত না। দাঁড়িয়ে দেখত মাত্র।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী আর মলিনা সেইমাত্র স্নান সেরে অপেক্ষা করছে গৃহিণীর জন্যে। জয়া এক পাশে দাঁড়িয়ে স্নানার্থীদের কোলাহল শুনছে, এমন সময় তার চোখ দুটো পড়ল বৌরাণীদের উপর। যেমন রঙের চটক তেমনি শাড়ী গয়নারও। ধপধপে রঙে ঝল্‌মলে জরিপাড় শাড়ী, ঝকমকে গা-ভর্তি গয়না চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। জমিদারের মাও এসেছেন। তাছাড়া আত্মীয়া আশ্রিতা মাসী বহু এসেছে তাঁর সঙ্গে। জয়া এদের সকলেরই মুখ চিনত। বৌরাণীরাও চিনতে পারলেন জয়াকে। তাঁরা হাসিমুখে তাকালেন জয়ার দিকে। জয়া সুযোগ বুঝে বললে, "চিনতে পারছেন আমাকে ?"

বড় বৌরাণী বললেন, "নিশ্চয়ই চিনেছি, সামনের বাড়ীতে থাকেন—রায়বাহাদুরের মেয়ে নয় ?"

জয়া মৃদু হেসে বললে, "ঠিক বলেছেন। আপনি আমায় 'তুমি' বলবেন।" ব'লে সম্মুখে দণ্ডায়মান জমিদারের মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে জয়া।

"সাবিত্রী সমান হও মা, পাকা মাথায় সিঁদূর দাও, স্বামী-সোহাগিনী হও।" ব'লে জমিদার-গৃহিণী জয়ার চিবুক ধ'রে চুম্বন করলেন। জমিদার-গৃহিণী এক মিনিটে কত আশীর্বাদ ক'রে ফেললেন। আশীর্বাদের ঘটায় জয়া মনে মনে হাসলে। তারপর জয়া বললে, "মাসীমা, আজ আপনারা এত সকালে চান করতে এসেছেন?"

"আজ একটু বাজারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, ভাবলাম হাঙ্গাম চুকিয়েই যাই।"

জয়া বললে, "হাঙ্গামই বটে। এ-রকম ক'রে কি চান করা যায়? আমি তো কোনদিনই চান করি না এখানে।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে গৃহিণী বললেন, "সে কি মা, যত হাঙ্গামই হোক, চান কুণ্ডুতে করতেই হয়; না হ'লে চেঞ্জে এসে লাভ কি?"

"আমার শরীর ভালোই মাসীমা। বাবার জন্যে এসেছি চেঞ্জে।"

"কি অসুখ মা ওঁর?"

"লো ব্লাডপ্রেসার থেকেই হার্ট ডিজিজ।"

এমন সময় গৃহিণীও চান শেষ ক'রে এসেছেন ঝরণা থেকে। জয়া পরিচয় করিয়ে দিলে তার মা কাকিমাদের জমিদার-গৃহিণীর সঙ্গে। জমিদার-গৃহিণী বারে বারে অনুরোধ করলেন ওঁদের বাড়ী যাবার জন্যে। এঁরাও প্রতিশ্রুতি দিলেন যাবার। বাড়ী ফিরে জয়া বললে, "বাবা ঠিক বলেছেন—চমৎকার লোক। বেশ আলাপী আর সরল। কোন অহঙ্কার নেই।"

গৃহিণী বললেন, "বাস্তবিকই, চমৎকার লোক। বনেদী বড়লোক, কাজেই নিরহঙ্কার।"

জয়া বললে, "সত্যি কাকিমা, জমিদার সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেল। আমি ভাবতাম—ওরা সকলে দাম্ভিক আর নিষ্ঠুর।"

"সবাই কি তা হয় মা? তুমি যেমন বললে ও-রকম জমিদারও যথেষ্ট আছে। আবার ভালোও আছে।"

সেদিন সন্ধ্যেতে রায়বাহাদুরের সকলেই জমিদার-বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। রায়বাহাদুর, ডাক্তারবাবু, নলিনীবাবু আসর জমিয়ে বসলেন বৈঠকখানায়, আর গৃহিণীরা গেলেন অন্দর মহলে। দাসী অভ্যর্থনা ক'রে গৃহিণীর কাছে নিয়ে গেল। লতা পাতা ফল ফুল আঁকা আয়না-দেওয়া বিরাট ছাপর খাটে, দুগ্ধফেননিভ বিছানার উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে জমিদার-গৃহিণী ব'সে আছেন। দাসী তাঁর পদসেবা করছে। এমন সময় এঁরা প্রবেশ করলেন। গৃহিণী অভ্যর্থনার সুরে বললেন, "আসুন আসুন—বসুন এখানে।" ব'লে গদি দেখিয়ে দিলেন।

জয়ার মা বললেন, "মেজেয় কার্পেটের ওপর বসি। খাটে কেন?"

প্রবল আপত্তির সুরে গৃহিণী বললেন, "তা কি হয়, বসুন খাটে। পা তুলে আরাম ক'রে বসুন। জয়া-মা আমার বাঁ পাশে ব'স।"

জমিদার-গৃহিণীর আন্তরিক আদরে সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল। বিশেষ ক'রে জয়া অবাক হয়ে গেল এঁদের সরলতায়। জমিদার-গৃহিণী বৌরাণীদের ডেকে পাঠালেন। বৌরাণীরা এলে তিনি বললেন, "মা জয়ারাণী, তোমার কি ভালো লাগবে এই বুড়ীদের কাছে? তার চেয়ে বৌমাদের সঙ্গে যাও, গল্প করগে।"

জয়া লজ্জিত স্বরে বললে, "না না, আমার বেশ লাগছে এখানে।"

গৃহিণী নানারকম সেকালের গল্প আরম্ভ করলেন। উনি যখন বধূ ছিলেন তখন একবার নাকের উপর একটা ফোড়া হয়েছিল। ভীষণ যন্ত্রণা। ডাক্তারের বাড়ী লোক গেল। ডাক্তার দেখতে চাইলেন। কি করা যায় এখন? পরপুরুষকে মুখ দেখানো হতেই পারে না। প্রাণ গেলেও হবে না। হঠাৎ তাঁর শাশুড়ীর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি ঘোমটা চিবুক পর্যন্ত টেনে, নাকের ফোড়ার কাছের কাপড় খানিকটা গোল ক'রে কেটে দিলেন। সেই ফুটোর ভেতর দিয়ে ডাক্তার ফোড়া দেখলেন।

জয়া জিগ্যেস করলে, "আপনার তখন নতুন বিয়ে হয়েছে বুঝি?"

"তখন আমি দু ছেলের মা। বৈঠকখানার চাকরদের আজ পর্যন্ত আমি ভালো ক'রে মুখ দেখি নি। তারাও মুখের দিকে চাইতে সাহস পায় না। অন্দরের সব কাজ করে মেয়েমানুষ আর বাইরের সব কাজ করে চাকরে।"

জয়ার মা বললেন, "এখন বোধ হয় আপনাদের অত পর্দা নেই ?"

"অত নেই বটে, তবে আছে এখনও। বৌমারা বেরোন মোটরে, পায়ে হেঁটে কিংবা ট্রামে বাসে কোথাও যাবার হুকুম নেই। ওঁদেরও চাকরদের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। তবে এখানে চেঞ্জে এসেছি, কড়াকড়িটা একটু কম। আমি নিজে কিন্তু ঘোমটা পছন্দ করি না।"

ডাক্তার-গৃহিণী বললেন, "আপনারা নিজেরাই একহাত ঘোমটা টেনে এসেছেন আর আপনারা পছন্দ করেন না ?"

"না, তা করি না। মাথায় একটু কাপড় থাকলেই যথেষ্ট।"

বাইরের ঘর থেকে তখন খুব গান বাজনার শব্দ আসছিল। রায়বাহাদুর-গৃহিণী বললেন, "আপনার বাড়ীতে খেলাধূলো, গান বাজনা, ছবি আঁকা—সব রকম চর্চাই আছে !"

"তা আছে। কর্তার ওসবের খুব সখ ছিল। তিনি খুব ভালো শিকারীও ছিলেন। আমার বড় ছেলের খুব খেলাধূলোতে সখ, মেজোর শিকারে আর ছোটর গান বাজনা ছবি-আঁকা। এ নিয়েই ও মশগুল থাকে।"

জয়া বললে, "আসবার সময় হলঘরে বড় বড় পেণ্টিংগুলো যে দেখলাম, ওগুলো কার আঁকা ?"

"দু-একটা বাদে সবগুলোই আমার ছোট ছেলে অলোকের আঁকা। এ নিয়েই সে মেতে থাকে।"

জয়ার মা বললে, "আমার মেয়েও আঁকতে জানে। গান-বাজনাও জানে। বিশেষ ক'রে আঁকবার ওর বড় সখ, তাই এত কথা জিগ্যেস করছে।"

জয়া লজ্জিত স্বরে বললে, "জানতাম, চর্চা অভাবে ভুলতে বসেছি।"

"বেশ মেয়ে আপনার। লেখাপড়া কত দূর হয়েছে ?"

জয়ার মা বললেন, "এম. এ. পাস করেছে ইংরিজীতে।"

এম. এ. পাস! জমিদার-গৃহিণী চোখ বিস্ফারিত করলেন।

"ওমা, এত বিদ্যে জয়ারাণীর!" তারপর জয়াকে বললেন, "গানবাজনা, ছাব-আঁকার চর্চা কর না কেন?"

জয়া লজ্জিত বদনে মুখ নীচু ক'রে ব'সে রইল।

জমিদার-গৃহিণী বললেন, "মেয়ের বিয়ে দেবেন না?"

ডাক্তার-গৃহিণী বললেন, "বিয়ে দেবেন বৈ কি। তবে এম. এ. পাস আর এতগুলো গুণ যার, তাকে একটু দেখে শুনে দিতে হবে তো। মনের মতো পেলেই দেওয়া হবে।"

এমন সময় দুজন দাসী প্রচুর খাবার আর একজন জল নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। মেঝেতে আসন পেতে জল ছিটিয়ে খাবারের থালা রেখে গেল। গৃহিণী মিষ্টিমুখ করতে অনুরোধ করলেন। রায়বাহাদুর-গৃহিণী ও ডাক্তার-গৃহিণী বললেন, "এত খাবার? বাড়ীতে আর ভাত খেতে হবে না। এত খাবার খাওয়া যায়? যদি জানতাম সকাল থেকেই পেট খালি রাখতাম।"

"কি আর এমন দেওয়া হয়েছে, প্রথম দিন একটু মিষ্টিমুখ করতে হয়ই। খাও মা জয়ারাণী, মা মলিনা, থালায় হাত দাও।"

মলিনা বললে, "কিছু তুলে নিতেই হবে। এত খাওয়া অসম্ভব।"

প্রবল ভাবে ঘাড় নেড়ে জমিদার-গৃহিণী বললেন, "তা হবে না। সব বাড়ীর তৈরী, কারুর অসুখ করবে না। নির্ভয়ে খান আপনারা।"

বৌরাণীরাও শাশুড়ীর সঙ্গে জেদ করতে লাগল। অগত্যা সবই খেতে হোল এঁদের। দাসী হাত ধোবার জল, তোয়ালে আর মিষ্টি পান দিয়ে গেল। পান চিবোতে চিবোতে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বললেন, "সন্ধ্যেটা বাড়ীতে আর কাটতেই চায় না। আজ সময় কেটে গেল কোথা দিয়ে বুঝতেই পারলাম না। ভেবেছিলাম, রোজ আসব সন্ধ্যেতে, মহানন্দে কেটে যাবে; কিন্তু এখন দেখছি তা হবে না।"

জমিদার-গৃহিণী বললেন, "কেন হবে না ?"

"এ রকম ভুরিভোজের আয়োজন করলে কি আসা যায় ? আজ প্রথম দিন না হয় করেছেন, কিন্তু আর কোনদিন করবেন না। গল্পসল্প ক'রে চ'লে যাব, এই তো বেশ।"

ডাক্তার-গৃহিণীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই জমিদার-গৃহিণী বললেন, "প্রথম দিন ব'লেই দেওয়া হোল। এজন্য এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন ? আমরা যে দিন যাব এর দ্বিগুণ খাইয়ে দেবেন তা হ'লেই শোধ হয়ে যাবে।"

গৃহিণীর কথায় লজ্জিত ভাবে জয়ার মা বললেন, "আমাদের এমন পাকা রাঁধুনী নেই যে এত রকম মিষ্টি করতে পারে, আর এখানের বাজারের খাবার —সে তো অখাদ্য।"

বৌরাণীরা হেসে বললে, "মিষ্টি খাওয়াবার দরকার নেই। তার চেয়ে ভাত খাওয়াবেন। দেখবেন কত ক'রে খেয়ে আসি। আর আপনাদের আফশোষ থাকবে না।"

বৌরাণীদের কথায় সকলেই হেসে উঠল।

সে দিন সন্ধ্যেটা বেশ ভালো ক'রেই কাটল। বাড়ীতে এসে কর্তার কাছে সকলেই প্রশংসা করলে ওঁদের অমায়িক ব্যবহারের।

কর্তা বললেন, "আমি যখন বলতাম তোমরা হাসতে, এখন দেখলে তো সত্যি কিনা! শত পুরুষের বনেদী বড়লোক, ওদের অহঙ্কার থাকতেই পারে না।"

জয়া বললে, "ওঁরাও আসতে চেয়েছেন বাবা।"

"নিশ্চয়ই আসবেন। দেখিস হয়তো কাল পরশুর মধ্যেই এসে হাজির হবেন।"

যত ভালো ব্যবহারই করুক না কেন, রায়বাহাদুরের বাড়ীর মেয়েরা প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও দিন-কতক জমিদার-বাড়ীতে গেলেন না। অবশ্য রায়বাহাদুররা তিন বন্ধু নিয়মিতই সান্ধ্য আসরে যেতে লাগলেন। সন্ধ্যেটা তাস, পাশা, দাবায় বেশ কাটতে লাগল তাঁদের।

১৯

তখন অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভা ধীরে ধীরে পাহাড়ের চূড়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়ী বৃক্ষ লতা গুল্ম ঝোপ ঝাড়গুলিও সেই আভায় রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। দিনের অবসানে আর সন্ধ্যার আগমনের সেই সন্ধিক্ষণের অপূর্ব রহস্যময় রূপের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলেন রায়বাহাদুরের গৃহিণী আর মেয়েরা। এমন সময় জমিদার-বাড়ীর মেয়েরা এসে দাঁড়ালেন, কখন যে ওঁরা এসে দাঁড়িয়েছেন, এঁরা জানতেও পারলেন না। হঠাৎ জয়ার চোখ পড়ল জমিদার-গৃহিণীর দিকে। জয়ার মনে হোল, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক শ্বেত মর্মরমূর্তি। শুভ্র বর্ণ, শুভ্র পরিচ্ছদ, অপূর্ব অঙ্গসৌষ্ঠব। সর্বোপরি অপূর্ব তাঁর মহিমান্বিত ভাব। সে যেন নূতন দেখছে—এমনি ক'রে অবাক হয়ে চেয়ে রইল কয়েক মিনিট।

জমিদার-গৃহিণী হেসে বললেন, "কি মা, কি দেখছ অবাক হয়ে আমার দিকে ? এর মধ্যেই ভুলে গেলে নাকি ? চিনতে পারছ না ?"

তাঁর কথায় জয়ার মা, মলিনা, কাকিমার চোখ পড়ল তাঁর ওপর।

"ওমা, আপনি এসেছেন?" ব্যস্ত হয়ে সকলে প্রণাম করলে তাঁকে। জয়াও তাড়াতাড়ি প্রণাম ক'রে লজ্জিত ভাবে মুখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। জয়ার চিবুক স্পর্শ ক'রে জমিদার-গৃহিণী বললেন, "অমন ক'রে মুখ নাবিয়ে রইলে কেন ?"

জয়ার কাকিমা বললেন, "আপনার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিল, তাই লজ্জা পেয়েছে।"

"বেশ করেছিলে দেখছিলে, তাতে লজ্জা পাবার কি আছে ?

গৃহিণী বললেন, "চলুন বাড়ীর ভেতরে।"

"এখানেই বেশ। এমন সুন্দর সন্ধ্যে ভেতরে যেতে ইচ্ছে হয় না।"

মলিনা ছুটে বাড়ীর ভেতর গেল কয়েকটি চেয়ার চাকর দিয়ে পাঠাবার জন্যে। বৌরাণীরা বললে, "আপনারা যান নি কেন কদিন ?"

ঢোঁক গিলে বললে জয়া, "আমরা তো বড়লোক নই, তাই সঙ্কোচ হয়।"

"তোমাদের কেবল ঐ এক কথা। বড়লোক, বড়লোক, বড়লোক! সব সময় শুনতে ভালো লাগে ?"

জয়া হেসে ফেললে বৌরাণীদের কথায়। বললে, "বলেন কি ? বড়লোক শুনতে আপনাদের ভালো লাগে না ? এই বড়লোক শোনবার জন্যে কতজন হাজার হাজার টাকা খরচ করে, আর আপনাদের ভালো লাগে না ?"

"না ভাই, সত্যি ভালো লাগে না। তুমি কোন সঙ্কোচ ক'রো না, রোজ যেয়ো সন্ধ্যেবেলা।"

খাওয়া-দাওয়ার গল্পগুজবে রাত্রি দশটা বেজে গেল। বিদায়কালে বারে বারে ওঁদের যাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে গেলেন। যেটুকু সঙ্কোচ ছিল এঁদের মনে, ওঁদের আন্তরিকতায় সব অন্তর্হিত হোল। কাজেই এঁদের আর যাতায়াতের কোন বাধা রইল না। প্রতি সন্ধ্যায় মজলিশ আরম্ভ হোত নিয়মিত। গল্পে গুজবে সময়টা একবারে তরতরিয়ে চ'লে যেতে লাগল। কিন্তু জয়ার মন সময় সময় কলকাতার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। সমিতি থেকে নিয়মমত চিঠিপত্র আসে বটে, তবুও প্রতিদিন কেবল আড্ডা দিয়ে কাটাতে তার ভালো লাগে না। কাজেই মাঝে মাঝে মন খারাপ ক'রে ব'সে থাকে। মনের অবস্থা বুঝতে পেরে মা বললেন, "কলকাতায় সময় পাস না, এখানে একটু গানের চর্চা করলেই তো পারিস। আর চারদিকে এমন সুন্দর সিনারি—ছবি তুলিস না কেন ?"

কাকিমা বললেন, "ছবি আঁকতেও জান, তা আঁকলেও তো পার।"

"ক্যামেরা এনেছ মা ?"

"হ্যাঁ, ক্যামেরা এনেছি।"

"যে বিদ্যেগুলো কষ্ট ক'রে শিখেছিস, চর্চা করিস, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।"

"মা, রঙ তুলি কাগজ এসব তো নেই।"

"সব এনেছি মা গুছিয়ে। জানি পরে তোর আর সময় কাটতে চাইবে না। কেবল হারমোনিয়াম, তবলা আর তানপুরাটা আনা হয় নি। লিখে দেব অনিলকে—পুজোর সময় নিয়ে আসবে।"

কাকিমা বললেন, "ছোট থেকে পয়সা খরচ ক'রে শিখলে সব, এখন চর্চা রাখ না কেন?"

"সত্যি কাকিমা, সময় পাই না। তাছাড়া চার বছর সব ছেড়ে দিয়েছি, এখন না পারি ভালো গাইতে, না পারি আঁকতে। প্র্যাকটিস অভাবে সবই নতুন লাগছে। আচ্ছা কাকিমা, কাল থেকে ক্যামেরা নিয়েই সুরু করি। কাল ভোরে প্রথম তোমাদের সবার ফোটো তুলব।"

"বেশ তো, তাই ক'রো।"

পরদিন সকালে সকলে বাগানে বসেছেন, এমন কি মালী দরোয়ান চাকর রাঁধুনী সবাই। জয়া বারে বারে তাদের বসার কায়দা দেখিয়ে দিচ্ছিল। ও-পাশে জমিদার-বাড়ীর সকলে তখন ঘুমে অচেতন। এ-পাশে অলোক অর্থাৎ ছোট কুমার যে কখন জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়ে দেখছে আর মৃদু মৃদু হাসছে তা জয়া জানতেই পারলে না। যাই হোক, জয়া তাড়াতাড়ি ফোটো তোলার কাজ শেষ করলে।

তারপর বললে, "কতদিন অভ্যেস নেই, কি রকম হবে তা জানি না।" হঠাৎ চোখ পড়ল জয়ার জমিদার-বাড়ীর জানলার দিকে। ছোট কুমারের দিকে নজর পড়তেই সে চোখ ফিরিয়ে চ'লে গেল। জয়ার ভীষণ লজ্জা হোল। তার ফোটো তোলবার কীর্তি হয়তো দেখছিলেন এতক্ষণ ব'সে। ছি ছি! বেচারী কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল।

জয়ার কাকিমা তার মুখের ভাব দেখে বললেন, "জয়া, তুমি এত ভাবছ কেন? ফোটো তোমার ভালোই হবে।"

"না কাকিমা, ফোটো যেমনই হোক তার জন্যে ভাবছি না। তবে তোমাদের জমিদার-বাড়ীর আর্টিস্ট এতক্ষণ জানলা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলেন, আমার দিকে চোখ পড়তেই স'রে গেলেন।"

"তাতে আর দোষ হয়েছে কি? সেকেলে বনেদী বড়লোক ওরা, ধারণা করতেই পারে না—মেয়েমানুষ ফোটো তুলবে। তাই দেখছিল বোধ হয় অবাক হয়ে।"

"যে কাণ্ড ক'রে আমি ফোটো তুললাম, উনি কি ভাবছেন কে জানে!"

"কিছু ভাবছে না। তুমি ওসব বাজে কথা চিন্তা ক'রো না।"

সে দিনই বেলা প্রায় আটটার সময় জমিদার আর তাঁর ম্যানেজার এসে হাজির হলেন। খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পর বললেন, "আজ দুপুরে আমাদের বাড়ীতে দুটি ডালভাত খেতে হবে।"

রায়বাহাদুর বললেন, "আবার এসব ঝঞ্ঝাট কেন?"

ম্যানেজারবাবু বললেন, "আজ কয়েকটা মুরগী মারা হবে। তাই একটু খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হবে—বার-বাড়ীতে আর কি!"

ডাক্তারবাবু বললেন, "বার-বাড়ীতে কেন?"

"ও বাবা! বড্ড বিচার আমাদের বাড়ীর। সব আলাদা ব্যবস্থা।"

তিন বন্ধুকে খেতে যাবার জন্যে বারে বারে অনুরোধ ক'রে গেলেন তাঁরা।

দ্বিপ্রহরের খাওয়াটা বেশ ঘটা ক'রেই হোল। যদিও উপলক্ষ্য মুরগী, কিন্তু নানা রকম আয়োজন হয়েছিল।

আয়োজনের ঘটা দেখে নলিনীবাবু হেসে বললেন, "জমিদার-বাড়ীর ডাল-ভাত বোধ হয় এ রকমই হয়। যাক, ভালো ক'রে প্রাণ ভ'রে খেয়ে নিই, আর তো কপালে এমন ডালভাত জুটবে না। কি বল তোমরা?" ব'লে তিনি বন্ধুদের দিকে চাইলেন। উপস্থিত সকলে নলিনীবাবুর কথায় হেসে উঠলেন।

খাওয়ার বর্ণনা শুনে গৃহিণী বললেন, "আমি ঐ রকমই ভেবেছিলাম। বেড়াতে যেতে যা খাওয়াবার ঘটা তাতেই বুঝতে পেরেছিলাম।"

রায়বাহাদুর বললেন, "আমাদেরও খাওয়াতে হবে একদিন।"

গৃহিণী বললেন, "তা হবে। তবে এখন নয়। পুজোর পর।"

কর্তা বললেন, "যখন হোক একবার খাওয়ালেই হোল।"

সন্ধ্যের সময় জমিদার-বাড়ীর পরিচারিকা এসে রায়বাহাদুরের মেয়েদের ডেকে নিয়ে গেল গল্প করবার জন্যে। এঁরা তিন বন্ধু তো সন্ধ্যে হ'লেই ওখানে গিয়ে বসতেন। জয়ার মেয়েদের মজলিস বিশেষ ভালো লাগত না। বাইরে ছোট কুমারের ঘরে যে গানবাজনার আসর বসত ওর মন টানত ওদিকে। তবু সেখানে খানিকটা শিল্পচর্চা হয়। সে অন্যমনস্ক হয়ে ব'সে থাকত। বড় বৌরাণী বললে, "তোমার ভালো লাগছে না এখানে, নয়? গান শুনবে? যাবে বইরের ঘরে?"

জয়া অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "না না, বাইরের ঘরে যাব কেন? গান তো এখান থেকেই শুনতে পাচ্ছি।"

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বললেন, "জয়া নিজে গান জানে, তাই এত আগ্রহের সঙ্গে শোনে।"

জমিদার-গৃহিণী আর বৌরাণীরা জেদ করতে আরম্ভ করলে জয়াকে গান গাইবার জন্যে। জয়া বেচারী বিব্রত হয়ে পড়ল। বললে সে বৌরাণীদের, "তাস খেলতে খেলতে আমায় নিয়ে পড়লেন কেন? গান শুনতে কে না ভালোবাসে?"

"তুমিই বা গাইতে এত আপত্তি করছ কেন?"

"আমি পাঁচ বছরের মধ্যে একবারও গান গাই নি। এখন হঠাৎ আপনারা বললে কি ক'রে গাইব?"

"ওমা, সে আবার কি কথা? ঘর-সংসারী নও, কোন ঝামেলা নেই, এই বয়সেই তো গাইবে গান।"

"ঘর-সংসারী না হ'লেও আমার গানের সময়ই হয় না। কলকাতায় এত ব্যস্ত থাকি আমি, ঠিক সময় নাওয়া-খাওয়াও হয় না।"

"কি এমন কাজ তোমার ভাই? শুনতে পারি কি?"

জমিদার-গৃহিণী বললেন, "বিদ্যের তো জাহাজ। আর কিসের জাহাজ বলতেই হবে মা জয়ারাণী।"

জয়া অন্য দিকে চেয়ে ব'সে রইল চুপ ক'রে। মলিনা এতক্ষণ চুপ ক'রে সব শুনছিল। সে বললে, "আচ্ছা, আমিই বলছি জয়াদির কি কাজ। জয়াদি মহিলা সমিতির সেক্রেটারী, সমিতির সব কিছু দায়িত্ব তারই উপর। তাছাড়া বস্তি সংস্কার, দুঃস্থের সেবা, কোন গরীবের মাথা গোঁজবার জায়গা নেই, কে রোগে ওষুধ পাচ্ছে না, কে মদ গিলে সন্ধ্যাতে বৌকে ঠ্যাঙাচ্ছে, কার মাইনে বাড়ানো দরকার—এ রকম হরেক কাজ তাকে করতে হয়। অনেক দিন খাবারও সময় পায় না, সব সময় ব্যস্ত।"

জয়া মলিনাকে থামিয়ে বললে, "হয়েছে, এবার চুপ কর তুমি।"

জমিদার-গৃহিণী ও বৌরাণীরা মলিনার কথা সাগ্রহে শুনছিল। মলিনাকে জয়া থামিয়ে দিতে বললেন, "বলতে দাও জয়ারাণী, থামিয়ে দিচ্ছ কেন?"

"কি সব আজে বাজে বকছে, ওসব কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না।"

গৃহিণী হেসে বললেন, "এতে লজ্জা কিসের! খুব ভালো কাজই কর। গরীবের দুঃখ ক'জন বোঝে? যারা বোঝে তারা দেবতা।"

লজ্জিত স্বরে জয়া বললে, "ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কি যে বলেন আপনি! আমি এমন কিছুই করি না।"

ডাক্তার-গৃহিণী বললেন, "কিছুই কর না। কেবল বস্তিতে বস্তিতে সখ ক'রে ঘুরে বেড়াও সময় কাটাবার জন্যে, নয়?"

জয়া বললে, "যা খুসী আপনারা বলুন, আমি চললাম।"

বড় বৌরাণী বললে, "জয়া ভাই, রাগ ক'রো না। আমাদের এই পাপ-কানে তোমার দয়াধর্মের কথা না হয় একটু শুনলামই।"

মেজো বললে, "বস্তি যা নোংরা, তোমার ঘেন্না করে না?"

জয়া কোন কথারই জবাব দিলে না। গম্ভীর হয়ে ব'সে রইল। ওর গাম্ভীর্য দেখে জমিদার-গৃহিণী বললেন, "তুমি রাগ ক'রো না জয়ারাণী, আর আমরা কিছু বলব না।"

পরদিন বেলা এগারটা। জয়া তখন জানলার ধারে ব'সে নিবিষ্ট মনে কি যেন চিন্তা করছে, এমন সময় গৃহিণী কতকগুলি চিঠি জয়ার হাতে দিলেন। কয়েকটি সমিতির মেয়েরা লিখেছে আর একটি কল্যাণের। কল্যাণ বস্তির আর সেবকসঙ্ঘের বিস্তারিত খবর দিয়েছে। আর লিখেছে পুজোর সময় সে দেশে যাবে। তার ছুটি কিছু পাওনা আছে। লক্ষ্মীপুজোর পর রাজগীরে যাবার চেষ্টা করবে ইত্যাদি। চিঠিগুলো প'ড়ে জয়া উতলা হয়ে উঠল। নাওয়া খাওয়া ত্যাগ ক'রে কাজের মধ্যে ডুবে থাকার আনন্দ আবার সে কবে পাবে? পিতার হার্টের অসুখ তো ভালোই আছে। পুজোর পর কল্যাণ আসুক, সে কলকাতায় যাবেই।

বিকেলে চা খাবার পর জয়া বললে, "কাকাবাবু, আজ কোথায় যাবেন বেড়াতে?"

"কেন? তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

"যাবার ইচ্ছে আছে।"

ডাক্তারবাবু বন্ধুদ্বয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "কোথায় যাবার ইচ্ছে তোমাদের? পাহাড়ে ওঠবার?"

রায়বাহাদুর বললেন, "না হে ডাক্তার, বেশী ঘন ঘন পাহাড়ে উঠলে আবার আমার হার্টের অসুখ—"

ডাক্তারবাবু বন্ধুকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ব'লে উঠলেন, "ওহো, তোমার বুকের ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম।"

নলিনীবাবু হেসে বললেন, "কি রকম ডাক্তার তুমি, রুগীর কথা মনে থাকে না?"

"এখানে এসে ভাই সব যেন ভুলে গেছি।"

"তবু রুগী তোমার চোখের সামনেই রয়েছে।"

"তার জন্যেই বোধ হয় ভুলে যাচ্ছি বেশী।"

এমন সময় মলিনা সেখানে উপস্থিত হোল। বললে, "জয়াদি, আমিও যাব ভাই।"

"বেশ তো, চল। যাও তো ভাই মলিনাদি, মা কাকিমারা আমাদের সঙ্গে যাবেন কিনা জিগ্যেস ক'রে এসো।"

মলিনা বললে, "আগেই আমি জিগ্যেস করেছি। ওঁরা যাবেন না। সন্ধ্যেতে জমিদার-বাড়ী যাবেন বললেন।"

পাহাড়ের কোলে মাঠে মাঠে বেশ খানিকটা ঘুরে সন্ধ্যের সময় তাঁরা বাড়ী ফিরলেন। জয়া আর মলিনা পাশাপাশি দুটি চেয়ার টেনে ব'সে পড়ল। জয়ার মা আর কাকিমা বললেন, "তোমরা যাবে না ওদের বাড়ী?"

জয়া বললে, "না।"

মলিনার অবশ্য যাবার খুবই ইচ্ছে, কিন্তু জয়াকে একা বাড়ীতে রেখে তার বোধ হয় যাওয়া উচিত হবে না। কাজেই সাত-পাঁচ ভেবে সে বললে, "যাচ্ছি তো রোজই। আজ না হয় আমরা দু বোনে গল্প করি।"

জয়া বললে, "না মলিনাদি, তুমি যাও।"

"না ভাই, আজ যাব না।"

অগত্যা গৃহিণী ও ডাক্তারবাবুর স্ত্রী চ'লে গেলেন।

জয়ার কি হোল তা জয়াও জানে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ'লে গেল, কিন্তু মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না। মলিনার অস্তিত্ব যেন সে ভুলেই গেল। শুক্লা-পঞ্চমীর চাঁদ তখন আকাশে হাসতে সুরু করেছে। দূরে দিগন্তের কোলে আলোছায়ার মিতালি। সুদূরপ্রসারিত পর্বত-শ্রেণীর পাদদেশে বিস্তৃত বনানী স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে অপূর্ব রহস্যময় মূর্তি ধারণ করেছে। মধ্যে মধ্যে জ্যোৎস্না লুকোচ্ছে মেঘের কোলে, এবং আরও রহস্যময় ক'রে তুলছে দিগন্তকে। জয়া তন্ময় হয়ে প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ দেখছিল। বাইরে ছিল সে নীরব, নিথর, কিন্তু ভেতরে তার উত্তাল তরঙ্গ বইতে লাগল। জয়ার সেদিন প্রথম মনে হলো, সে একাকী, সে নিঃসঙ্গ, সে অসহায়। এমন একজন তার দরকার, যে সুখে দুঃখে,

বিপদে আপদে তার পাশে থাকবে। সে কে? কোথায় পাবে তাকে? মিলবে কি তার সন্ধান? নারীর বুভুক্ষু অন্তরের চিরন্তন প্রশ্ন। হয়তো মিলবে কিংবা চিরদিনই তাকে খুঁজতে হবে। রহস্যময়ী প্রকৃতির ছোঁয়া লাগল তার মনের দ্বারে। সে সব ভুলে গেল—তার বস্তি, সমিতি, দুঃখী ভাইবোন। কেবল একটা তীব্র ব্যথা, তীব্র অনুভূতি, তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাকে অস্থির ক'রে তুলল।

পুজো এসে পড়ল। যদিও বাংলার বাইরে, তবুও প্রবাসী বাঙালীরা চাঁদা তুলে প্রতিমা করেছেন। পুজোর আনন্দে সবই ভরপুর। চারিদিকে বোধনের বাজনা বাজতে সুরু করেছে। কলকাতা থেকে অনিল সুশীল এসেছে। জমিদার-বাড়ীতেও লোক বেড়েছে। অনিল বললে, "কি রে জয়া, সামনের বাড়ীর সঙ্গে ভাব হয়েছে?"

"ভীষণ ভাব হয়েছে দাদা বাড়ীর সবার সঙ্গে। সন্ধ্যে আসর তো ওদের বাড়ীতেই হয়।"

"শুনলাম নাকি কোথাকার জমিদার ওরা! চাঁদা পাওয়া যাবে মনে হয়?"

"চাইলে দেবেন ব'লেই মনে হয়। আমার কিন্তু এখানে কিছু চাইতে ইচ্ছে নেই দাদা।"

"কেন রে? অনিচ্ছে তো কখনও দেখি নি। ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার কিছু নয়, তবে—চাইতে হয় তোমরা চেয়ো। আমার দ্বারা হবে না।"

"সে কি হয় ভাই! চাইতে তোকেই হবে। ওদিকে আমাদের চেয়ে তোরই হাতযশ বেশী। নে দিকি কিছু মোটা টাকা বাগিয়ে, নাইট স্কুলটা দাঁড়িয়ে যাক।"

"জোড় হাত ক'রে বলছি দাদা, আমার দ্বারা হবে না। তোমরাই চেয়ো। আমায় নিয়ে টানাটানি ক'রো না।"

একটু চুপ ক'রে থেকে অনিল বললে, "বেশ, তাই হোক। দিন কয়েক যাক, আমিই চাইব। তবে আলাপটা করিয়ে দিবি তো ?"

"আলাপ বাবা কাকারাই করিয়ে দেবেন। আজ সন্ধ্যেতে আলাপ হয়ে যাবে।"

সত্যিই সেদিন অনিল সুশীলের সঙ্গে জমিদার-বাড়ীর আলাপ হয়ে গেল। রাত্রি দশটার পর খুসীমনে দু'ভাই ফিরে এসে বললে, "বাঃ, সন্ধ্যেটা বেশ তোফাই কেটে গেল। তুই যাস না কেন রে ? বেশ মানুষ ওরা। তুই একা ব'সে থাকিস কেন ?"

"অত গোলমাল আমার ভালো লাগে না।"

"গোলমাল আবার কি ? দিব্যি গান বাজনা, খানা পিনা, খেলা ধূলো, গল্প সল্প—চমৎকার পরিবেশ। কারুর বিশেষ ইউনিভারসিটির ডিগ্রী নেই বটে, কিন্তু দুনিয়ার সব খবর রাখে। বেশ কালচার আছে। চল্ কাল আমাদের সঙ্গে।"

জয়ার সেই একই কথা, "না দাদা, আমার বাগানে নির্জনে ব'সে থাকতে খুব ভালো লাগে। তোমরা যাও। আমায় টানাটানি ক'রো না।"

সে দিন জমিদার-গৃহিণী বললেন, "তোমরা সবাই চ'লে আস আর জয়া একা একা রাত দশটা পর্যন্ত কি করে ? কেন আসে না সে ? তার কি এখানে ভালো লাগে না ?"

জয়ার মা থতমত খেয়ে বললেন, "ওর বোধ হয় এখানে আসতে লজ্জা করে, তাই আসে না। তাছাড়া চিরকালই একটু চুপচাপ, বেশী কথাবার্তা ভালোবাসে না।"

জমিদার-গৃহিণী বললেন, "অবশ্য আমাদের মাঝে ছেলেমানুষের না ভালো লাগবারই কথা। তবে অলোকের ওখানে গান-বাজনা হয় সেখানে ওর ভালো লাগতে পারে।"

কথাটার মোড় ঘোরাবার জন্যে কাকিমা বললেন, "ও একটু একা একা থাকতেই ভালোবাসে, ভাবুক তো।"

সেদিন বাড়ীতে এসে গৃহিণী বললেন, "জয়া, একেবারে ওঁদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করলি কেন? মাঝে মাঝে গেলেই পারিস। প্রত্যেক দিন গিন্নী তোর খোঁজ করেন।"

জয়া বললে, "অতক্ষণ বসতে আমার ভালো লাগে না মা।"

"বেশ তো, একটু ব'সেই না হয় উঠে আসবি।"

"তা কি হয় মা! সবাইকে ফেলে বিনা কারণে কি উঠে আসা যায়? আচ্ছা, যাব মাঝে মাঝে।"

মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী আর মহানবমীতে জমিদার-বাড়ী আর রায়বাহাদুরের বাড়ীর সকলে একসঙ্গে খুব বেড়িয়েছেন সন্ধ্যে থেকে। মায়ের আরতি, তারপর সমস্ত রাত ধ'রে নানা রকম হাসি কৌতুক যাত্রা। রাত বারোটা পর্যন্ত সবাই থাকতেন দুর্গামণ্ডপে। দেখতে দেখতে দশমী এসে পড়ল। সন্ধ্যায় প্রতিমা-নিরঞ্জনের পর সব প্রণাম আর কোলাকুলির ধুম প'ড়ে গেল।

স্বয়ং জমিদার প্রস্তাব করলেন, "আজ আমরা সবাই একসঙ্গে ব'সে গল্প করব। কি বলেন?" ব'লে রায়বাহাদুর আর তাঁর বন্ধুদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

"নিশ্চয়ই, এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব আর কি হতে পারে!"

প্রকাণ্ড হলঘরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে সবাই গল্প জুড়ে দিলেন প্রাণভরে। প্রধান বক্তা স্বয়ং জমিদার। ভারি সুন্দর বৈঠকী গল্প করতে পারেন তিনি। বর্তমান আর ভবিষ্যৎ ভুলে রায়বাহাদুরের বাড়ীর সবাই গল্পের মধ্যে নিমগ্ন হলেন। বহুদিন তাঁরা এ রকম আনন্দ পান নি। বাজল প্রায় বারোটা।

রায়বাহাদুর বললেন, "এবার ওঠা যাক। বহু বিজয়া চ'লে গেছে জীবনের উপর দিয়ে, কিন্তু আজ যেমন আনন্দ হোল, এ রকম আর কখনও হয় নি।"

নলিনীবাবু বললেন, "শুধু মন নয়, উদরও কম আনন্দ পেল না।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "শুধু কি তাই? রসনাও আজ যে রস গ্রহণ করলে, আর কোনদিন সে পাবে কি না সন্দেহ!"

জয়া বাড়ীতে এসে বললে, "বাবা, তোমরা গেলে আর উঠতে চাও না। বাবার দেখছি হার্টের অসুখ একেবারে সেরে গেছে। যেদিন থেকে এসেছেন এখানে, সমানে হৈ-হৈ করছেন।"

মলিনা বললে, "আমারও এত ভালো লাগে ওঁদের, মুখে বলা যায় না।" তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "কিন্তু আর ক'টাই বা দিন! যাবার সময় তো হয়ে এল!"

"কবে যেতে হবে মলিনাদি?"

"লক্ষ্মীপুজোর পর যেতেই হবে।"

জয়া মলিন সুরে বললে, "তুমি চ'লে যাবে, দাদারা কাকারা কাকিরা—সবাই যাবেন। থাকব কি ক'রে একা বল তো?"

"একা কেন থাকতে হবে? আমি গেলে বাবা আসবেন, কল্যাণবাবুও আসবেন।"

"কল্যাণ আর কদিন থাকবে! তা ছাড়া সরকার-কাকা তো জমিদার-বাড়ীর দাবার আড্ডায় মশগুল হয়ে থাকবেন বুঝতেই পারছি।"

লক্ষ্মীপুজোর আগেই গৃহিণী জমিদার-বাড়ীর সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন রাত্রিতে। সন্ধ্যায় সকলে এলেন। বাগানেই বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ডাক্তারবাবু বললেন, "এমন চাঁদের আলো। গান গাও অলোক।"

অনিল উৎসাহিত সুরে বললে, "খুব ভালো প্রস্তাব। এমন চাঁদিনী রাতে গান-না হ'লে কি সাজে?"

জয়ার কিন্তু সেদিন গান শুনবার ইচ্ছে ছিল না। এমন সুন্দর রাত নীরবে নিজের সত্তাকে ডুবিয়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো যায়! পাহাড়, লতা, গুল্ম, ঝোপের সঙ্গে জ্যোৎস্নার লুকোচুরি হয়তো আর জীবনে দেখবার সুযোগ আসবে না। প্রকৃতির এই মনোহর রূপ জয়াকে অস্থির ক'রে তুলল। সে আসর থেকে একটু স'রে, অপলক দৃষ্টিতে চাঁদের দিকে চেয়ে রইল।

ছোটকুমার অলোকের কি হোল কে জানে? এমন সুন্দর পরিবেশেও তার গান কিছুতেই জমতে চাইলে না। বারে বারেই তাল কাটতে সুরু হোল। সে তার এক বন্ধুকে গাইবার অনুরোধ ক'রে একটু স'রে, চুপ ক'রে ব'সে রইল। দুজনেই মৌন, কিন্তু অন্তর মুখর। দুজনেরই শূন্য দৃষ্টি চেয়ে রয়েছে শূন্যের দিকে। কিন্তু অন্তরদৃষ্টি কি আজ তাদের পরিপূর্ণ? তবে কি জয়ার ব্রত ভাঙল? মন তার টলল? রায়বাহাদুরের ইচ্ছা পূর্ণ হবে? এতগুলো জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেন, একমাত্র সেই প্রেমের ঠাকুর যিনি নর-নারীর চিররহস্যময় অন্তর সৃষ্টি করেছেন।

সেদিন বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়ার পর্ব মিটে গেল।

খাবার পর অনিল বললে, "আমাদের যাবার সময় কাছিয়ে এল, এবার রাজগীরের জিনিসগুলো দেখা দরকার।" তারপর জিগ্যেস করলে জমিদার মশায়কে, "আপনারা নিশ্চয়ই পাহাড়গুলো সব চ'ড়ে আর নালন্দা ঘুরে দেখে এসেছেন?"

জয়া নিকটেই ছিল, দাদার কথায় হাসি পেল। যারা পাল্কী চ'ড়ে স্নান করতে যায়, যাদের দু পা হাঁটলে চাকরদের দু ঘণ্টা পা টিপতে লাগে, তারা চড়বে পাহাড়?

জমিদার মশায় বললেন, "না অনিলবাবু, কিছু দেখা হয় নি। আপনারা তো এসেছেন, এবার হবে।"

"আমাদের তো তল্পিতল্পা গুটোবার সময় হোল। লক্ষ্মীপুজোর পর-দিনই গুটি গুটি যেতে হবে কলকাতায়।"

"বেশ তো, আজই প্রোগ্রাম ঠিক করুন। কালই বেরিয়ে পড়া যাবে। ছোট গ্রাম এটা, এমন কিইবা দেখবার আছে! দু-তিন দিনেই শেষ হয়ে যাবে।"

ডাক্তার ও নলিনীবাবু দুজনেই ব'লে উঠলেন, "ছোট গ্রাম বটে, কিন্তু এককালে এই রাজগীর ধনে সম্পদে বিদ্যায় সংস্কৃতিতে ঐতিহ্যে ভারতে

অদ্বিতীয় ছিল। দেখবার চোখ থাকলে এই গণ্ডগ্রামে এখনও এমন অনেক জিনিস আছে যা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।"

জমিদার মশায় একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললেন, "তা তো ঠিকই। বৌদ্ধযুগের সম্পদশালিনী রাজধানী রাজগীর, ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়—লক্ষ্মী সরস্বতী দুই বোন অকৃপণ হাতে দান করেছিলেন তাঁদের ঐশ্বর্য এই গ্রামটিকে। তবে সত্যিকারের কজনেরই বা চোখ আছে এসব দেখবার আর মগজে বিদ্যে বুদ্ধি আছে এসব বোঝবার ?"

ডাক্তার ও নলিনীবাবু দ্বিগুণ অপ্রস্তুত হয়ে কুণ্ঠিতভাবে বললেন, "আপনি রাগ করলেন ?"

জমিদার মশায় হো-হো ক'রে প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন, "আরে রামঃ! রাগ করব কেন ? এর মধ্যে রাগের কথা কি হোল ?"

রায়বাহাদুর কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললেন, "আচ্ছা, কাল কোন্‌দিকে যাওয়া যাবে বলুন তো ?"

জমিদার মশায় বললেন, "কোন দিকেই যখন যাওয়া হয় নি, তখন যে কোন দিকে গেলেই হোল।"

সুশীল বললে, "চলুন কাল নালন্দায় যাওয়া হোক। কাল নটার ট্রেন ধ'রে গেলে বেলা দশটায় পেঁছিনো যাবে। একটু হাঁটতে হবে বটে নালন্দা পর্যন্ত, তবে সন্ধ্যের আগেই পেঁছিনো যাবে।"

জমিদার-গৃহিণী বললেন, "খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ?"

"কেন, সেখানে চড়ুইভাতি করলে কেমন হয় ?"

বৌরাণীরা বললেন, "যাচ্ছি দু ঘণ্টার জন্যে বেড়াতে, ওসব হাঙ্গামা করার দরকার নেই মা।" তারপর জয়ার মা আর কাকিদের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনাদের কি মত ?"

"ওসব হাঙ্গামার দরকার নেই। খাবার সঙ্গে নেওয়াই ভালো। ওসবে বড় হাঙ্গাম।"

জমিদার-গৃহিণী বললেন, "খাবার, জল আমরাই ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে যাব। শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে লোক তো আমরা কম নয়। আপনাদের আর কোনও হাঙ্গাম করতে হবে না।"

"কিছু সামান্য নিয়ে যাব বৈকি। সব বোঝা আপনারা বইবেন?"

এবারে জয়া বললে, "নটায় ট্রেন হ'লে স্টেশনে গিয়ে পৌঁছুতে হবে অন্তত পৌনে নটায়। আপনাদের ঘুম ভাঙবে?"

বৌরাণীরা বললেন, "নিশ্চয়ই ভাঙবে। ঘুম ভাঙালেই ভাঙে।"

জমিদার-গৃহিণী বললেন, "কত দেশ বিদেশ ঘুরেছি মা। শেষ রাতে ট্রেন ধরেছি। তোমার কিছু ভয় নেই। কাল সব একসঙ্গে আনন্দ করতে করতে যাওয়া যাবে। সকালে কেবল চা খেয়েই বেরিয়ে পড়া হবে। ওখানে পৌঁছে খাবার খেয়ে ঘুরে ফিরে দেখে. দুপুরে ভাত খেয়ে একটু বিশ্রাম। তারপর বিকেলের ট্রেনে ফেরা যাবে। কি বল জয়ারাণী?"

জয়া বললে, "খুব ভালো, চমৎকার প্রোগ্রাম।"

জমিদার-বাড়ির ব্যাপারই আলাদা। যেখানেই যান না কেন, খাওয়ার ত্রুটি সহ্য করতে এঁরা অভ্যস্ত নন। কাজেই হাঁড়ি, ডেকচি, হাতা, খুন্তি, থালা, ঘটি, বাটি, গেলাস, রেকাব, কাপ, প্লেট, চামচ, ঝুড়ি, ঝোড়া, কুঁজো, ফ্লাস্ক, আসন, মাদুর, শতরঞ্জি, চাদর, বালিশ—সে এক সমারোহের ব্যাপার, তারপর দাস দাসী আত্মীয় আশ্রিত তো আছেই। ট্রেনের তিনটে কামরা এঁরাই দখল করলেন।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বললেন জমিদার-গৃহিণীকে, "করেছেন কি? মাত্র তিন-চার ঘণ্টার জন্যে ঘর-সংসার উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন?"

গৃহিণী হেসে জবাব দিলেন, "পেটে দুটো দিতে তো হবে, আবার দুপুরের দিকে একটু গড়াতেও হবে তো? এসব লটবহর না হ'লে কি চলে বৌমা? কোন ঝক্কিই আমাদের পোয়াতে হবে না, পুরনো লোকজন সব ঠিক ক'রে দেবে।"

"তা তো দেবে, কিন্তু ওখানে গড়াবার জায়গা আছে কি ?"

"নিশ্চয়ই আছে। আর কিছু না হোক, গাছতলা তো আছেই।"

জয়া বললে, "শুধু কি তাই, গ্রামোফোন, ক্যামেরা, ছবি আঁকবার তুলি—নেই কি ? এমন কি তুলসী-গঙ্গাজলও।"

বৌরাণীরা বললেন, "ট্রেনে কত জাতের ছোঁয়া লাগে, তাই তুলসী-গঙ্গাজল সঙ্গেই যাচ্ছে।"

এসব ব্যাপার জয়ার কাছে অশ্রুতপূর্ব এবং অচিন্তনীয়।

মলিনা বললে, "আমার শ্বশুর-বাড়ীতেও তাই, কোথাও গেলে তুলসী-গঙ্গাজল সঙ্গে যাবেই।"

জয়া বললে, "যত সব কুসংস্কার। জাত কি ভগবান করেছেন ? জাত আবার কি ?"

রায়বাহাদুর ভাবলেন, এই জাত নিয়ে জয়া আবার তর্ক জুড়ে দেবে। একে থামানো দরকার। তিনি বললেন, "সব জিনিসেরই অর্থ আছে মা, তুমি ছেলেমানুষ বুঝতে পার না।"

জয়াও বুঝলে এসব নিয়ে আলোচনা এখানে যুক্তিসঙ্গত হবে না। হয়তো তর্কাতর্কি হয়ে যাবে।

হৈ-হৈ করতে করতে নালন্দায় সব পৌঁছল। তারপর টিকিট কেটে একদল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর ঢুকে পড়ল। গেটের কাছে পাঁচ-ছটি গাছতলা জুড়ে চাকরেরা বেশ পরিপাটি ক'রে বিছানা করলে। আশ্রিতা মাসী পিসীর দল জলখাবার গুছোতে বসল। একটি গাইড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার, স্নানাগার, ছাত্রদের থাকবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর সব ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিলে। প্রায় এক ঘণ্টার ওপর ঘোরাফেরা ক'রে বাইরে এলেন সবাই। অলোক ভিতরের ফোটো তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু গাইড নিয়ম নেই ব'লে তাকে অনুমতি দেয় নি। তারপর সবাই লাইন বেঁধে খেতে বললে। যেন নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে ভোজ চলেছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা এ রকম ব্যাপার কখনও চোখে দেখে নি, ছুটে এল দেখতে। শুধু কি ছোটরা ? নালন্দা গ্রামের সকলেই

একবার কৌতুক-দৃষ্টিতে দেখে গেল এঁদের ভোজসভা। জমিদার-গৃহিণীর আদেশে তাদের লুচি মিষ্টি দেওয়া হোল। জলযোগের পর অলোক বসল ছবি আঁকতে ; বৌরাণীরা, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী, জয়ার মা—সবাই বসলেন তাস খেলতে ; ছেলেরা বসল গ্রামোফোন চালাতে। ছোট গ্রামটি এদের কলরবে সচকিত হয়ে উঠল। একান্তে একটু স'রে জমিদার-গৃহিণী জপ করতে বসলেন।

অলোক খানিকক্ষণ এঁকে বললে, "অনিলবাবু, চলুন গ্রামটা একটু ঘুরে দেখে আসা যাক। তারপর শেষ করব।"

অনিল বললে, "অতি উত্তম প্রস্তাব। অনিল সুশীল কয়েকটি বন্ধু উঠে দাঁড়াল গ্রাম পরিক্রমার জন্যে।

অনিল বললে, "জয়া, তুই যাবি না ?"

"হ্যাঁ দাদা, যাব। মলিনাদিকে ডাকি।" ব'লে জয়া মলিনাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, সে যাবে কি না ? বৌরাণীদের সঙ্গে সে তখন তাস খেলায় ব্যস্ত। মলিনার হয়ে বড় বৌরাণী বললে, "আমাদের একটু দেরী আছে।"

জয়ার কাকিমা বললেন, "তোমাদের পেছনে আমরাও যাচ্ছি, এই শেষ হোল ব'লে।"

জয়া ফিরে এসে বললে, "দাদা, চল। ওঁরা এখন খেলায় ভীষণ ব্যস্ত।"

বেলা দুটোর সময় আবার সকলে বসল। রাত্রি তিনটে থেকে রান্না করেছে ঠাকুর। সেগুলো আবার গাছের তলায় ইঁট সাজিয়ে কাঠ জোগাড় ক'রে গরম হোল। খেতে খেতে গৃহিণী বললেন, "বাবা, এ যেন বিয়ে-বাড়ীর নেমন্তন্ন। কত রকম !"

জমিদার-গৃহিণী হেসে বললেন, "পেটের জন্যেই তো সব। পেট না ঠাণ্ডা থাকলে বেড়িয়ে আরাম হোত ?"

ডাক্তার-গৃহিণী বললেন, "ঝোল ভাতই তো পেট ঠাণ্ডা রাখবার ভালো ব্যবস্থা।"

"তা ঠিক, তবে আমাদের তো অন্য কোন কাজ নেই, এই খাওয়াটাকেই কালচার করেছি আর কি!"

সকলে হেসে উঠল। একটু বিশ্রাম ক'রে বিকেল চারটের মধ্যেই আবার মালপত্তর গরুর গাড়ীতে ভর্তি ক'রে যাত্রা সুরু হোল। জয়া মলিনা ছেলের দল গাড়ীতে উঠল না। তারা চলল পায়ে হেঁটে স্টেশনের দিকে। চলতে চলতে সূর্যদেব অস্তগামী হলেন। সবুজ ক্ষেত সোনার বর্ণ ধারণ ক'রে উঠল। জয়া মনে মনে আবৃত্তি করলে—

"এস সোনার বরণী রাণী গো,
এস শঙ্খকমল করে।"

২২

লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিন। পূর্ণচন্দ্রের মনোরম স্নিগ্ধ আলোয় প্রকৃতি দেবী অপরূপ দীপ্তিময়ী হয়ে উঠেছেন। শৈল-শিখর চাঁদের আলোয় ঝক্‌ঝক্‌ করছে। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, প্রান্তর, জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত। অন্নহীন দেশে, অন্নদাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পূজা, বাজারে সাড়ম্বরে পূজা হচ্ছে। দুই বাড়ীর সকলেই গেছেন পূজা দেখতে। কেবল জয়া বাগানে চেয়ারে গা এলিয়ে একদৃষ্টে চাঁদের দিকে চেয়ে আছে।

প্রায় ঘণ্টা দুই পর সকলেই ফিরে এলেন। বাগানেই বসলেন সবাই গল্প করতে। এ-কথা সে-কথার পর নলিনীবাবু বললেন, "লক্ষ্মীপূজো তো হোল। এবার তল্পি-তল্পা গুটোনো যাক, কি বল?"

ডাক্তারবাবু সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন, "আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলাম।"

রায়বাহাদুর প্রবল আপত্তির সুরে বললেন, "না না, তা হতে পারে না। নলিনীর তো এখন বাণপ্রস্থ। এত তাড়া কিসের?" আর ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললেন, "তোমারই বা কি দরকার কলকাতায়?"

ডাক্তার হেসে বললেন, "আমার বুঝি আর প্র্যাকটিস করতে হবে না? সব নষ্ট হ'য়ে গেল!"

রায়বাহাদুর বললেন, "নষ্ট হোল, না, ছাই। ভালো ডাক্তারের রোগী কখনও হাতছাড়া হয় না। তাছাড়া তোমরা দুজন মাত্র। তোমাদের ভাবনা কি? থাকলে আমার একটু উপকার হয়।"

ডাক্তার বললেন, "তোমার হার্টের অসুখ, কতদিন থাকতে হবে ঠিক আছে?"

মৃদু হেসে রায়বাহাদুর জবাব দিলেন, "সেরেছে মনে হয়, বেশীদিন আর থাকতে হবে না।"

জমিদারবাবু বললেন, "ফাল্গুন পর্যন্ত থাকুন। তারপর আর থাকা সম্ভব নয়। সকলকেই যেতে হবে। যে গরম পড়ে এখানে।"

ডাক্তারবাবু আর নলিনী বোস ব'লে উঠলেন, "ওরে বাবা, ফাল্গুন! এতদিন থাকা অসম্ভব। সুশীলের অনিলের সঙ্গেই যেতে চাই।"

"আচ্ছা, সে পরের কথা। এখন কাল কোন্ দিকে যাওয়া হবে ঠিক করুন।"

রায়বাহাদুর বললেন, "চলুন কাল পাহাড় দেখতে। খুব ভোরে গিয়ে বেলা দশটা এগারটায় নামলেই হবে। আর ভোরে গেলে সূর্যোদয়ও দেখা হবে।"

জয়া বললে, "সূর্যোদয় দেখতে হ'লে রাত তিনটেয় বেরোতে হবে। এত ভোরে ওঠা কি সম্ভব?"

মেজবৌরাণী বললেন, "নিশ্চয়ই সম্ভব। ইচ্ছে থাকলে সবই করা যায়।"

জয়া বললে, "দেখা যাক আপনার ইচ্ছের শক্তি কতদূর!"

বাস্তবিকই রাত তিনটেতে দত্তদের সকলে এবাড়ীর দরজা ধাক্কাধাক্কি সুরু করলে। রায়বাহাদুরদের সকলে তখনও বিছানায় শুয়ে। ব্যস্ত হয়ে জয়া দরজা খুলে তাঁদের বসতে ব'লে, তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে গেল। তাড়াহুড়ো ক'রে আধ ঘণ্টার মধ্যেই এঁরা প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দত্তদের সঙ্গে দুটি চাকর চা আর খাবার নিয়ে চলল।

রায়বাহাদুর বললেন, "আমাদের হারিয়ে দিলেন। মনে অহঙ্কার ছিল আমাদের—খুব ভোরে উঠি ব'লে, আজ তা চূর্ণ হোল। এরই মধ্যে আবার চা খাবারের ব্যবস্থাও ক'রে ফেলেছেন।"

কুমার বাহাদুর বললেন, "অতি সামান্য।"

গৃহিণী বললেন, "এত অন্ধকার থাকতে চলেছি আমরা, কোন জন্তু জানোয়ার বেরোবে না তো ?"

মেজোকুমার বললেন, "না, তা বেরোবে না। এখন তো বেশ ধবধবে চাঁদের আলো। তারপর আমাদের সকলেরই একটা ক'রে টর্চ আছে। পাহাড়ের কাছে যেতে যেতেই প্রায় ফরসা হয়ে যাবে।"

পাহাড়ে অল্প একটু উঠতেই সকলে দেখতে পেলেন, সূর্যদেব ধীরে ধীরে উদিত হচ্ছেন। যেন একটি প্রকাণ্ড সিঁদুর-মাখানো গোলক উঠছে ধীরে ধীরে অতল গহ্বর থেকে। ক্রমশ চারদিক আভাময় হয়ে উঠতে লাগল। সকলে অনেকক্ষণ সে দৃশ্য তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলেন। ক্রমশ সূর্যদেব কিরণ বর্ষণ করতে সুরু করলেন। পাহাড়ের একটা জায়গায় ব'সে সবাই চা খেয়ে নিলেন। তারপর তাঁরা পাহাড় থেকে নেবে, কুণ্ডুর পাশ দিয়ে চললেন গৃদ্ধকূট দেখতে। দুটি গরুর গাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল। যাঁরা হাঁটতে পারবেন না, তাঁরা চললেন গাড়ীতে। ছেলেরা, মলিনা, জয়া, বৌরাণীরা হেঁটেই চলল। প্রথম পড়ল মণিয়ার মঠ। কথিত আছে, বৌদ্ধ যুগে এখানে মৃৎপাত্র পোড়ানো হোত। মণিয়ার মঠ ছেড়ে ডান দিকে কিছুদূর যেতেই পড়ল শোনভাণ্ডার। কথিত আছে, রাজা জরাসন্ধ এখানে তাঁর বিপুল ধন-ভাণ্ডার রাখতেন। শোনভাণ্ডার ছেড়ে তাঁরা জরাসন্ধের মল্লভূমিতে এলেন। তারপর এলেন গৃদ্ধকূট পাহাড়ে। শোনা যায়, এই পাহাড়ের গুহার ভিতর বুদ্ধদেবের শিষ্য আনন্দ বাস করতেন। পাহাড়ের শিখরদেশে ইঁট দিয়ে বাঁধানো বিরাট এক চত্বর। বুদ্ধদেব সেখানে ব'সে শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। এখান থেকেই দেখা যায় একটি পার্বত্য নদী তির তির ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে। কিংবদন্তী, এখানেই অর্জুন তীরবিদ্ধ ক'রে গঙ্গার সৃষ্টি করেছিলেন। জায়গাটি

অতি মনোরম! মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশ, আশেপাশে শৈলশ্রেণী, নীচে পার্বত্য নদী, মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

অনিল বললে, "ফোটো তুলে নিন অলোকবাবু, সুন্দর সিনারি।"

অলোক বললে, "সত্যিই সুন্দর। মিস মিত্র, আপনি ফোটো তুলুন।"

জয়া লজ্জিত সুরে বললে, "না হয় ভালোই জানেন ফোটো তুলতে, তা ব'লে আমায় ঠাট্টা করছেন!"

অলোক অপ্রস্তুতের সুরে বললে, "ছিঃ ছিঃ, ঠাট্টা করব কেন, আপনি ভালো জানেন না ব'লে প্রমাণ তো পাই নি। যাক্‌গে, দোষ যদি হয়ে থাকে ক্ষমা চাইছি।"

বৌরাণীরা কৌতুকে হেসে উঠল।

রায়বাহাদুরের পরিবারের কলকাতা যাবার তোড়জোড় হতে লাগল। অনিল ও সুশীলের অফিস, ডাক্তারের প্র্যাক্‌টিস আর নলিনীবাবুর বড় মেয়ে আসবে কলকাতায় বাপের সঙ্গে দেখা করতে। মলিনার শ্বশুরও চিঠি দিয়েছেন তাগাদা দিয়ে। কাজেই কাউকেই ধ'রে রাখা সম্ভব নয়।

জয়া ম্লানস্বরে বললে, "মলিনাদি, লক্ষ্মিটি ভাই, তুমি তোমার শ্বশুরকে একটা চিঠি লিখে অনুমতি চাও না—আরও কিছুদিন এখানে থাকবার জন্যে।"

মলিনা দুঃখিত স্বরে বললে, "জয়াদি, যদি ফল হোত আমার চিঠিতে, নিশ্চয়ই লিখতাম। কলকাতা আর এখান ক'রে চার মাসের ওপর এসেছি শ্বশুরবাড়ী থেকে, আর থাকলে ওঁরা ভয়ানক রাগ করবেন।"

"আচ্ছা, তুমি ঠিক ক'রে বল তো, এখানে ভালো লাগছে? যদি আরও থাকতে পাও খুসী হবে?"

"খুব খুসী হব ভাই। এত আনন্দে আছি, ভালো লাগবে না? উপায় থাকলে নিশ্চয়ই থেকে যেতাম। আমরা মেয়েমানুষ—জন্ম থেকেই অধীন, জন্ম থেকেই পরের ইচ্ছেতে চলতে ফিরতে হয়। আমরা তো আর স্বাধীন নই।"

"তোমার তো শ্বশুরবাড়ীর ওপর জোর আছে।"

"হ্যাঁ, আমাদের আবার জোর! ওসব আমাদের সাজে না ভাই।"

জয়া বললে, "এ আমি স্বীকার করি না মলিনাদি। জোর সব মেয়েরই আছে। তবে চাই তাকে খাটাবার।

"আমরা যে অক্ষম তা তোমরা জানই তো। লেখাপড়া জানি না, উপায় করবার মুরোদ নেই। আমাদের কি জোর খাটানো নিয়ে মাথা ঘামালে চলে? কাজেই চুপচাপ হুকুম মেনেই চলি।"

জয়া ভাবলে, কথাটা ঠিক। বাস্তবিক এরা কি করতে পারে? করবার ক্ষমতা যখন নেই, তখন সহ্য করা ছাড়া উপায় বা কি?

রায়বাহাদুরের বাড়ী ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু বাড়ী কেন, সকলের মনও ফাঁকা হয়ে গেল। সেদিন বিকেলে জয়া বাগানে ব'সে আছে উদাসভাবে। এমন সময় অলোক বললে, "আসতে পারি মিস মিত্র?"

"নিশ্চয়ই পারেন।" ব'লে পাশের চেয়ার দেখিয়ে বললে, "বসুন।"

অলোক ব'সে বললে, "সকলে চ'লে গেলেন, পাড়াটাও ফাঁকা হয়ে গেল। আপনার খুব মন খারাপ লাগছে, নয়?"

"তা তো লাগছেই। তাছাড়া কতদিন কলকাতা ছাড়া, আর ভালো লাগে না।"

সহানুভূতি দেখিয়ে অলোক বললে, "তা তো লাগবেই না। আমাদেরই লাগছে না, আর আপনার তো ওখানে কত কাজ! বস্তি, সমিতি, স্কুল—কত কি।"

জয়া আশ্চর্য হয়ে বললে, "আপনি জানলেন কি ক'রে?"

"বাঃ, আপনাকে কে না জানে? কলকাতা থাকতেই আপনার নাম জানতাম। কাগজে আপনার বক্তৃতা পড়েছি, তবে তিনিই যে আপনি এটা মাত্র কয়েক দিন হলো জানতে পেরেছি।"

এ কথার আর কি উত্তর দেবে! জয়া চুপ ক'রে ব'সে রইল।

অলোক একটু ইতস্তত করে বললে, "একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই পারেন।"

"অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে প্রায় বছর পাঁচেক আগে আপনিই থার্ড হয়েছিলেন, নয় ?"

বিস্ফারিত নেত্রে অলোকের দিকে তাকিয়ে জয়া বললে, "হ্যাঁ।" তারপর কি যেন চিন্তা ক'রে বললে, "ও ! আপনিই বোধ হয় ফাস্ট´ হয়েছিলেন, না ?"

"হতে পারে।" ব'লে অলোক মৃদু হাসল। তারপর বললে, "মিস মিত্র, আপনি এত ভালো গান জানেন, ক মাসের মধ্যে একদিনও গান গাইলেন না ?"

"সময় পাই না কলকাতায়, তাই ছেড়ে দিয়েছি।"

"সে কি ? যত কাজই থাকুক, বিদ্যে কি ছাড়তে হয় ? এখানে তো সময়ের অভাব নেই, কাল থেকেই লাগিয়ে দিন।"

নিস্পৃহসুরে জয়া বললে, "কলকাতার জন্যে মনটা বড় ব্যস্ত হ'য়ে আছে, তাই কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি নে।"

"তা তো ঠিকই। তবে এখানে ব্যস্ত হয়ে তো কিছু করতে পারবেন না। শুধু শুধু মন খারাপ ক'রে লাভ কি ? আর বড় জোর দু মাস। যেতেই তো হবে সেখানে।'

কয়েক মিনিট ইতস্তত ক'রে অলোক কুণ্ঠিত স্বরে বললে, "যদি মনে কিছু না করেন, একটা প্রস্তাব করতে চাই আপনার কাছে। অনুমতি যদি দেন তবে বলতে পারি।"

জয়ার প্রাণ দুরু দুরু ক'রে কাঁপতে লাগল। কি কথা বলতে চায় জমিদারনন্দন ? কি প্রস্তাব ? এমন কি কথা যে এত কুণ্ঠিত স্বর ? কিন্তু বেশীক্ষণ তো চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায় না ! যা হোক একটা জবাব দিতেই হবে। ভয় কি ? মনে মনে সাহস আনে জয়া।

মৃদুস্বরে বলে সে, "বলুন আপনার কি প্রস্তাব ?"

সাগ্রহে বললে অলোক, "কাল থেকে দয়া ক'রে যদি আমাদের সান্ধ্য আসরের গানে যোগ দেন খুব খুসী হব আমরা।"

"ওঃ, এই কথা?" জয়া হেসে ফেললে। বললে, "গান তো আমি শুনতেই পাই। আর আসরে যোগ দিয়ে গাইবার মত বিদ্যে কি আমার আছে? যাও একটু জানতাম, তাও গেছি ভুলে।"

"না না, ভুলে যেতেই পারেন না। আমি শুনেছি আপনার গান। তবে হয়তো অভ্যেসের অভাবে একটু অসুবিধা হতে পারে। সে এমন কিছু নয়। যাবেন তো কাল থেকে?"

"কাল থেকেই যেতে পারব কি না কথা দিতে পারছি না, তবে যাব মাঝে মাঝে। বাড়ীতে একটু চর্চা ক'রে নিই, তার পর—"

এমন সময় রায়বাহাদুর এসে বললেন, "জয়া মা, অলোকের জন্যে একটু চা আন।"

অলোক আপত্তির সুরে বললে, "থাক্, থাক্, এখন আর চায়ের দরকার নেই।"

"না না, তা কি হয় বাবা?"

জয়া চায়ের জন্যে ভিতরে চ'লে গেল।

২৩

যতই ছোটকুমার অলোক গানের আসরে নিমন্ত্রণ করুক না কেন, জয়ার কিন্তু সঙ্কোচ লাগে। আর একজন সঙ্গী থাকলে হয়তো এত সঙ্কোচ হ'ত না। তবে তার গানের আসর ভালো লাগে খুব। বাগানে ব'সেই উৎকর্ণ হয়ে একটির পর একটি গান শোনে সে।

জয়া শুনলে, সরকার-কাকা শিগ্‌গির আসছেন। এক হপ্তার মধ্যেই হয়তো এসে পড়বেন। মনে করলে জয়া, পুজোর পর কল্যাণও আসতে চেয়েছিল। এ সময় একটা চিঠি লিখলে হয় তাকে আসবার জন্যে। জয়া সরকার মশায়কে লিখলে, কল্যাণের সঙ্গে দেখা করতে। আর কল্যাণকেও অনুরোধ করলে, সরকার-কাকার সঙ্গে চ'লে আসতে। কল্যাণ

লিখলে, এক মাসের পাওনা ছুটি নিয়ে সে আসছে। জয়া খুসীতে উছলে উঠল। কল্যাণ আসছে জানতে পেরে রায়বাহাদুর গম্ভীর হয়ে গেলেন। ওদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই তিনি রুগী সেজে চ'লে এলেন এতদূরে, এখানে এসেও নিস্তার নেই। এখানেও সেই শনি ধাওয়া করবে? কে তাকে আসতে লিখেছে? সে কি নিজেই আসছে? আড়ালে জিজ্ঞেস করলেন গৃহিণীকে, "কল্যাণ আবার আসছে কেন? কে লিখেছে তাকে আসতে?"

"জয়া লিখেছে।"

"তুমি জানতে?"

"জানতাম।"

ক্রুদ্ধস্বরে বললেন রায়বাহাদুর, "মা হয়ে কি তুমি মেয়ের ভবিষ্যৎ একটু ভাবো না? সামান্য আশার আলো দেখেছি, এমন সময় ধূমকেতুর মতো কল্যাণকে আনবার কি দরকার? আর কেনই বা মত দিলে তুমি? কেন বললে না—আমার অসুস্থ শরীরের কথা?"

গৃহিণী শান্তভাবে বললেন, "জমিদার-বাড়ীর যদি পছন্দ হয়েই থাকে জয়াকে আর জয়ারও যদি পছন্দ হয় অলোককে, তাহ'লে কল্যাণ এলেও আটকাবে না। আর ওদের পছন্দ হ'লেও শেষ পর্যন্ত জয়ার পছন্দ হবে না, তুমি দেখে নিও।"

"কি ক'রে জানলে তুমি?"

"মনে প্রাণে ও জমিদারদের ঘৃণা করে। আর ওদের সঙ্গে জয়ার মিল হতেই পারে না।"

"কে বললে? দুজনের যদি ভাব হয়ে যায়, এ সব বাধা তুচ্ছ হয়ে যাবে তখন।"

"তাই যদি হয়, তবে কল্যাণ আসবে শুনে তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন?"

"কল্যাণকে দেখলে জমিদার-বাড়ীর সবাই বিগড়ে যেতে পারে। ওরা ভাবতে পারে, এত বড় মেয়ে একটা অন্য ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করছে।"

"ওঁরা তা জানেন।"

"জানলেও চোখের সামনে দেখলে মন বিরূপ হয়ে যায়।"

"তা যদি হয় হোক। জয়া কি কোনদিন ঘোমটা টেনে ঘরে ব'সে থাকবে নাকি? কোনদিন বাইরের কাজ বন্ধ করবে মনে করেছ? লুকোচুরি ক'রে বিয়ে দিয়ে, তারপর জীবনভোর অনুতাপের পক্ষপাতী আমি নই। জয়ার মত পথ মতি গতি ওরা ভালো ক'রেই জানুক, তা সত্ত্বেও যদি বিয়ে দিতে রাজি হয়, আর জয়ারও যদি মত থাকে তবেই হবে।"

রায়বাহাদুর খিঁচিয়ে উঠলেন, "মস্ত বড় এক লেকচার ঝাড়লে, কিন্তু এ সব ব্যাপারে একটু লুকোচুরি করতেই হয়। একবারে বেপরোয়া হ'লে কাজ এগোয় না। তুমি কল্যাণকে আসতে বারণ ক'রে টেলিগ্রাম ক'রে দাও আর তাতে লিখে দাও—জয়াকে যেন লেখে বিশেষ জরুরী কাজের জন্যে সে আসতে পারলে না।"

"টেলিগ্রাম করতে হয়, তুমিই কর। আমি পারব না।" ব'লে গৃহিণী উঠে গেলেন সেখান থেকে।

ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রায়বাহাদুর স্ত্রীর গমনপথের দিকে। বিড়বিড় ক'রে বললেন, "ঘরের শত্রু বিভীষণ!"

রায়বাহাদুর ভাবলেন, মা হয়ে মেয়ের মঙ্গল চায় না—এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! মেয়ে চিরকাল পথে পথে কতকগুলো হতচ্ছাড়ার সঙ্গে ঘুরুক—এই তার ইচ্ছে! এত কষ্টে, এত কৌশলে বাগিয়ে আনছিলাম, সব যাবে ভেস্তে! আবার কি হার্টের অসুখে শুয়ে পড়বেন তিনি, যাতে কল্যাণ এসেও বেশী হৈ-হৈ ক'রে ঘুরতে না পারে। কিন্তু সত্যি তো তাঁর অসুখ নয়। শুনলেই ছেলেরা ডাক্তার ডেকে আনবে। তখন ধরা প'ড়ে যাবেন যে! কি করবেন তিনি? ভেবে আকুল হলেন রায়বাহাদুর।

দিন কয়েকের মধ্যেই সরকার মশায় আর কল্যাণ এসে পড়ল। বিশেষ প্রসন্ন চিত্তে রায়বাহাদুর কল্যাণকে গ্রহণ করলেন না। কিন্তু মনের ভাব

চেপেই রইলেন জয়ার অসন্তুষ্টির ভয়ে। সরকার মশায় ও কল্যাণকে পরিচয় করিয়ে দিলেন জমিদার-বাড়ীর সঙ্গে। সন্ধ্যেবেলা কল্যাণ জোর ক'রে জয়াকে নিয়ে গেল জমিদার-বাড়ী। গান-বাজনায় গল্প-গুজবে আসর একেবারে মেতে উঠল। কল্যাণ বললে জয়াকে, "এমন আসর ছেড়ে তোমার কলকাতার জন্যে মন কাঁদে? সময় কাটে না? আশ্চর্য!"

জয়া বললে, "বেশ তো, তুমি সব কাজকর্ম বন্ধ ক'রে থাক এখানে আসরের লোভে। দেখি কতদিন থাকতে পার!"

"কাজ ছেড়ে থাকা হয়তো বেশীদিন সম্ভব নয়, তবে যতদিন থাকব খুবই ভালো লাগবে, সে দিকে নিঃসন্দেহ।"

সেদিন বাড়ী ফিরতে রাত্রি এগারোটা হয়ে গেল। বাড়ীতে এসে সরকার মশায় আর কল্যাণ জমিদার-বাড়ীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন। চমৎকার লোক ওঁরা। এমন অমায়িক আর নিরহঙ্কার লোক দেখা যায় না।

কল্যাণ বললে, "অনিল সুশীলের কাছে যা শুনেছিলাম, একদম সত্যি। বরং আরও বেশী ভালো লাগল আমার।"

রায়বাহাদুরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জয়া কল্যাণের দিকে ফিরে বললে, "তোমরা যে বড়লোকের জয়গান সুরু করলে দেখছি!"

কল্যাণ বললে, "বড়লোকের জয়গান করছি না, তার গুণের জয়গান করছি। তোমার, জয়াদি, কতকগুলো বড্ড গোঁড়ামি আছে।"

"কিসে আমার গোঁড়ামি আছে?"

"আছে বৈ কি, তোমার ধারণা—বড়লোক মাত্রই স্বার্থপর, হৃদয়হীন, অসাধু, অহঙ্কারী ইত্যাদি। কিন্তু এটা যে কত বড় মিথ্যে তা তুমি জান না। মহৎ বড়লোকের দানের জন্যে কতকগুলো প্রতিষ্ঠান টিঁকে রয়েছে। তাঁদের দানে বহু গরীবের সংস্থান হয়েছে। কত ধনী আছেন যাঁরা হাসপাতাল স্কুল অনাথ-আশ্রমে অকাতরে দান করেন।"

জয়া ব্যঙ্গস্বরে বললে, "এ দানের পেছনে আছে মান সম্মান যশ আর খেতাবের আকাঙ্ক্ষা। এ সব না করলে তাঁরা রাজাবাহাদুর হবেন কেমন ক'রে ?"

"সব সময় তা নয় জয়াদি। এসব তোমার ভুল ধারণা।"

এমন সময় পেছন থেকে ছোটকুমার ব'লে উঠল, "মিস মিত্রের তো আমাদের সম্বন্ধে চমৎকার ধারণা দেখছি ! আমরা কিন্তু রাজা নই, বাহাদুরও হতে চাই নে। আমাদের কোন খেতাবও নেই। আমাদের সম্বন্ধে অন্তত এটুকু জেনে রাখবেন, নিজের স্বার্থের জন্যেও পরের উপকার করি নে।"

সকলেই ছোটকুমারের কথায় লজ্জায় কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল। ছোটকুমার ব্যাপারটা হাল্কা করবার জন্যে মৃদু হেসে বললে, "অবশ্য আপনাদের কথা আমি আড়ি পেতে শুনি নি। কুকুরটা চ'লে এসেছিল, তাকেই নিতে এসে কথাগুলো কানে গেল।"

রায়বাহাদুর কুণ্ঠিতভাবে বললেন, "তুমি কিছু মনে ক'রো না অলোক। যা ও মুখে বলেছে, বাস্তবিকই তা অন্তরের কথা নয়। কল্যাণ ওর সহপাঠী, পিঠোপিঠি ভাইবোন বললেই হয়, ওকে তর্কে হারাবার জন্যেই ওসব বলেছে।"

ছোটকুমার বললে, "মিস মিত্র যা বলেছেন খাঁটি সত্যি। কটা লোক দান করে নিষ্কাম ভাবে ? জমিদারদের অনেক দোষ আছে মেসোমশায়, সে কথা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। আপনি এতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন ? যা সত্যি তা স্বীকার করবার মতো সাহস আমার থাকা উচিত।" ব'লে ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেবার জন্যে বাগানেই তাদের পাশের চেয়ারে কুকুরের শেকল ধ'রে ব'সে পড়ল। অনাবশ্যক কতকগুলো কথাও ব'লে গেল। তারপর সকলের দিকে চেয়ে বললে, "রাত হয়েছে, আসি এবার।"

রায়বাহাদুররা সকলে বাড়ীর ভেতর এলেন। তারপর তিনি রেগে একেবারে ফেটে পড়লেন।

"সব সময় দোষ ধরা এক বদ অভ্যেস হয়েছে তোমার। বড়লোক হ'লেই খারাপ হয়—এ একটা কুসংস্কার। ভালো-মন্দ সবার মধ্যেই আছে। ছিঃ ছিঃ, এসব বাজে কথা শুনে শুনে আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। রাজাবাহাদুর না হই, আমিও তো রায়বাহাদুর। তাহোলে নিজের মেয়ের মতে আমিও তো ছোট হলাম। এ অবস্থায় ওদের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে আমি? ওরা বাড়ীতে হাসাহাসি করবে না? এমন জানলে লেখাপড়া শেখাতাম না কখনও।" ব'লে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে জয়া ও তার মায়ের দিকে চেয়ে চ'লে গেলেন শোবার ঘরে।

কল্যাণ লজ্জিত ভাবে বললে, "ছিঃ ছিঃ, বড্ড অন্যায় হয়ে গেল। ওঁরা খুব মনে কষ্ট করবেন।"

সরকার মশায় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "যা হয়ে গেছে তার জন্য হা-হুতাশ ক'রে লাভ নেই। এবার থেকে সাবধান হোলেই চলবে। ওঁরা যে রকম ভালো লোক, কিছু মনে রাখবেন না বোধ হয়।"

সরকার মশায়ের কথাই ঠিক হোল। পরদিন সকালেই তিন ভাইই উপস্থিত। রায়বাহাদুর আনন্দে কৃতজ্ঞতায় একবারে বিগলিত হয়ে পড়লেন। গৃহিণী, সরকার মশায়, কল্যাণ নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেললেন। চা খেয়ে সকলে বেড়াতে গেল।

বেড়াতে বেড়াতে এক সময় জয়া অলোকের কাছে ক্ষমা চেয়ে বললে, "কিছু মনে করবেন না। যদিও আপনাদের উপলক্ষ্য ক'রে কথাটা উঠেছিল, কিন্তু তর্ক হচ্ছিল সাধারণ ভাবে। বিশেষ কোন বড়লোককে উদ্দেশ ক'রে নয়।"

হেসে বল্লে অলোক, "কিছু মনে করলে আসতাম কি আপনাদের বাড়ী এই ভোরেই, তাও একা নয়, একেবার তিন ভাই? আর যা বলেছেন তা খাঁটি কথা। এতে যদি কেউ রাগ করে তারই অন্যায়। আপনি তার জন্যে ক্ষমা চাইবেন কেন? সত্যি কথা ব'লে কেউ ক্ষমা চায়?"

২৪

দিনকয়েক পর কল্যাণ বললে, "ছুটি তো অল্প, যা যা দেখবার আছে দেখে ফেলা দরকার, কি বল জয়াদি ?"

"দেখা তো দরকারই। চল, কাল থেকেই আরম্ভ করা যাক। প্রথমে চল নালন্দায়। তার পরদিন চল গৃদ্ধকূটে। বাকি পাহাড় কটা তো দেখেছই।"

"বলব নাকি জমিদারদের, সঙ্গে যাবার জন্যে ?"

"না না, দরকার নেই। একবার সবাই একসঙ্গে গিয়েছিলাম। সে এক বিরাট ব্যাপার! সমস্ত দিন ধ'রে কেবল খাওয়া। জিনিসগুলোর দিকে চেয়ে একবার ভাববারও সময় পাওয়া যায় না। ঘর সংসার সব যাবে সঙ্গে।"

"আচ্ছা, তবে আমরা বাড়ীর কজন যাই, কি বল ?"

"সরকার-কাকা আর আমরা দুজন।"

জয়া তার মাকে বলেছিল যেতে, কিন্তু গৃহিণী বললেন, "তোরা যা, দেখে আয়।"

ষ্টেশন থেকেই জয়া কল্যাণ সরকার মশায় হেঁটে গেলেন নালন্দা। সেখানে পেঁছে ফ্লাস্কের চা আর টিফিনকেরিয়ারের খাবারগুলির সদ্ব্যবহার করা হলো। তারপর সবাই অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিস দেখল। দেখা শেষে এক জায়গায় ব'সে উদাস ভাবে চেয়ে রইল তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। কল্যাণের মন চ'লে গেল সেই অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল দিনে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় অতীত দিনগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠল। কত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ ভক্ত, মহা সাধুর চরণের ধূলিতে ঐ স্থান পবিত্র। সর্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল ঐ বিদ্যালয়, এবং ভক্ত সাধু মহাজ্ঞানীর মিলনস্থানও ছিল এই নালন্দা গ্রামে।

কল্যাণ বললে, "জয়াদি, এক কালে যে নালন্দার জগৎজোড়া নাম ছিল, কালের প্রভাবে আজ তো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আমরাও যাব কোথায় মিলিয়ে, তা কে জানে? বিশ্বের পটভূমিকায় সেই মহান স্রষ্টার গৌরবময় সৃষ্টির এই পরিণতি হয় যুগে যুগে।"

পরের দিন চলল ওরা তিনজন গৃধ্রকূট দেখতে। গৃধ্রকূট পৌঁছতে বেলা প্রায় আটটা বেজে গেল। তখনও ভোরের কুয়াশা সম্পূর্ণ কাটে নি। উপরে অনন্ত আকাশ, নীচে স্রোতস্বিনী, চারিদিকে ধ্যান-মগ্ন শৈলশ্রেণী এক রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। ওরা তিনজনেই বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ দেখছিল। হঠাৎ সরকার মশায়ের চোখ পড়ল সামনের দিকে। একটি পাথরের চাঁইয়ের ওপর ব'সে কে যেন বিশ্বের এই সৌন্দর্য তুলিতে ধরবার চেষ্টা করছে। দূর থেকেও যেন চেনা মনে হয়। কে ছবি আঁকছে?

কল্যাণ বললে, "যেই হোক সরকার-কাকা, চলুন ওঁর ছবি দেখে আসি।"

"বেশ তো, চল।" ব'লে সরকার-কাকা এগোলেন।

কাছে এসে কল্যাণ বললে, "আরে, অলোকবাবু আঁকছেন! তাই দূর থেকে চেনা মনে হচ্ছিল। কখন এসেছেন?"

অলোক তুলি টানতে টানতেই বললে, "বেশীক্ষণ নয়। আধ ঘণ্টা হবে। আপনারা বসুন। একটু বাকি আছে, শেষ ক'রে নিই।"

"নিশ্চয়ই। আমরা বসছি। আপনি শেষ করুন।"

প্রায় পনর বিশ মিনিট পর অলোক তুলি রেখে বললে, "কতক্ষণ এসেছেন আপনারা? ঘুরে ফিরে দেখা হয়েছে?"

কল্যাণ বললে, "জয়াদির তো দেখাই। আমরাই দেখি নি। দেখব এবার।"

সামনে একটি সুজনি পাতা। তার উপর বেশ বড় একটি বাক্স আর একটি টিফিনকেরিয়ার। সুজনির এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে ব'সে

আছে বৈঠকখানার খাস চাকর। সরকার মশায় হেসে বললেন, "প্রাতঃকালেই রাজদর্শন, আশা করি সারাদিনটা খুব ভালো যাবে।"

অলোক বললে, "উৎপীড়ক অত্যাচারীর মুখ দেখলে দিন ভালো যায় ব'লে তো জানতাম না কাকাবাবু।"

পুরানো বিশ্রী আলোচনা আবার এসে পড়ল দেখে তিনি থতমত খেয়ে চুপ ক'রে গেলেন। সরকার মশায়ের মুখের ভাব দেখে অলোক হেসে ফেললে; বললে, "কাকাবাবু, আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। কারণ রাজা আমরা নই আর জমিদারও নই, তবে সামান্য তালুকদার বলতে পারেন।" তারপর জয়ার দিকে চেয়ে বললে, "আপত্তি যদি না থাকে বসুন মিস মিত্র, আর আপনারা দুজনে।"

"বাঃ, আপত্তি থাকবে কেন?" ব'লে কল্যাণ ব'সে পড়ল সুজনির ওপর। কিন্তু জয়া বসল না। বললে, "কল্যাণ, আমি একটু ঘুরে ফিরে আসছি।"

"শিগগির এসো জয়াদি।"

"এক্ষুনি আসছি। ওদিকটায় একটা গুহা আছে দেখে আসি।"

কয়েক মিনিট পর অলোক বললে, "চা খাবারের সদ্ব্যবহার করা যাক্, কি বলেন কাকাবাবু?"

"নিশ্চয়ই, যেখানেই যাওয়া যাক, পেট ঠাণ্ডা না থাকলে কোন শান্তি নেই।"

অলোক বললে, "মিস মিত্রকে ডেকে আনা দরকার।"

সরকার মশায় জয়াকে খুঁজে আনবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু কল্যাণ তাঁকে কিছুতেই যেতে দিলে না। বললে, "আপনি বসুন সরকার-কাকা, কোথায় ঘুরবেন পাহাড়ের ওপর? এখুনি ধ'রে আনছি জয়াদিকে।" ব'লে ত্রস্তপদে চ'লে গেল কল্যাণ।

অলোক নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কল্যাণের গমনপথের দিকে। অকারণে তার মুখ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। একটি নিশ্বাস ফেলে ছোটকুমার

বললে, "কল্যাণবাবু চমৎকার লোক! অনেক দিনের জানা-শোনা আপনাদের, নয়?"

"বোধ হয়। আমি ঠিক জানি না। দেশ থেকে এসে অবধি দেখছি ওকে। একসঙ্গে পড়াশুনো করেছে আবার দেশসেবাও করে দুজনে। গিন্নী ঠাকরুণ খুব পছন্দ করেন কল্যাণকে।"

অলোকের একবার মনে হোল জিগ্যেস করে, কর্তা কেমন পছন্দ করেন? কিন্তু এ প্রশ্ন ভদ্রতার বাইরে। কাজেই একটু ঘুরিয়ে বললে, "কল্যাণবাবুর খুব মিষ্টি স্বভাব, এ রকম আর আমার চোখে পড়ে নি। মেসোমশায়ও নিশ্চয়ই ওঁকে খুব ভালবাসেন?"

সরকার মশায় একটু আমতা আমতা ক'রে বললেন, "ওদের ঐ দেশের কাজটা উনি বেশী পছন্দ করেন না।"

এমন সময় হাসতে হাসতে জয়া আর কল্যাণ এসে উপস্থিত হোল।

অলোক বললে, "এই যে এসেছেন! বসুন দয়া ক'রে। ওরে গিরীশ, খেতে দে আমাদের।"

জয়া বললে, "আমাদেরও খুদ-কুঁড়ো এনেছি সঙ্গে।"

"বেশ তো, বের করুন, মিশিয়ে খাওয়া যাবে।"

গৃধ্রকূট থেকে ফিরে এলো ওরা বেলা প্রায় একটায়। ছোটকুমারের মনটা বিষাদাচ্ছন্ন হয়েই রইল। খেতে বসতে শুতে—এমন কি গানেও সে স্বস্তি পেল না। মনের ভেতর কেবল ঘুরে ফিরে একই চিন্তা—জয়ার কল্যাণের সঙ্গে খুব ভাব। এ জন্যে কল্যাণ আসার পর থেকে বেড়াতে দুজনেই যায়। কারুকে নেয় না সঙ্গে। কেবল গৃধ্রকূটে আর নালন্দায় সরকার মশায়কে সঙ্গে নিয়েছিল। কল্যাণ কলকাতায় ছিল ব'লেই জয়ার এত মন খারাপ। সন্ধ্যেবেলা বাড়ীতে কেউ না থাকলেও বাগানে একা একা আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে থাকা, গালে হাত দিয়ে চিন্তা করা। এবার বুঝতে পেরেছে, কার জন্যে ওর এত মাথাব্যথা! মরুক গে যাক, তার কি? সেই বা এ সব বাজে চিন্তা ক'রে মাথা ধরাচ্ছে

কেন? জয়ার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি? সত্যি তো, বাইরে থেকে দেখতে গেলে সম্বন্ধ তার কিছুই নেই। কিন্তু মনের সম্বন্ধ? সেই কি সবচেয়ে বড় নয়?

কয়েক দিন পরের কথা। সন্ধ্যের সময় কর্তা; গিন্নী, সরকার মশায় গেছেন জমিদার-বাড়ী। কেবল কল্যাণ আর জয়া রয়েছে বাড়ীতে। কল্যাণ বেচারা গানের আসরে যাবার জন্যে উন্মুখ, কিন্তু জয়া জোর ক'রে তাকে আটকে রাখলে।

"রোজ ভালো লাগে তোমার যেতে? আমার তো লাগে না। আজ বাড়ীতে থাক। সমিতির কতকগুলো জরুরী চিঠি এসেছে, উত্তর লিখে দি।"

"সমিতির চিঠি লিখবে তুমি। আমি থেকে কি করব? কাল সমস্ত দিন প'ড়ে আছে। উত্তর লেখবার কি সময়ের অভাব যে, এখুনি লিখতে হবে? কদিনই বা আছি, যাই ওদের বাড়ী।"

"ওদের বাডী যেতে চাও কেন? গানের জন্যে তো?"

"হ্যাঁ জয়াদি, আমার খুব ভালো লাগে গান শুনতে। অলোকবাবুর এত মিষ্টি গলা—"

"বেশ তো, চল, বাগানে বসি। স্পষ্ট শুনতে পাবে গান। আরও ভালো লাগবে তোমার। নির্জন পরিবেশে দূর থেকে ভেসে আসা সঙ্গীত আরও ভালো লাগবে কল্যাণ।"

অনিচ্ছুক কণ্ঠে কল্যাণ বললে, "তাই চলো।"

বাগানে এসে দুজনে বসল পাশাপাশি। জমিদার-বাড়ীতে আসর বসেছে তখন। গান ভেসে আসছে। গাইছে অলোকের বন্ধুরা। কয়েকটি গানের পর কল্যাণ বললে, "কই, অলোকবাবু গাইছেন না তো? বন্ধুরাই গেয়ে চলেছে। উনি গাইছেন না কেন?"

জয়া উদাসভাবে বললে, "বন্ধুরাও চমৎকার গায়। শোন মন দিয়ে।"

"ইস্! অলোকবাবুর কাছে তার বন্ধুদের গান! কি যে বল তুমি! আচ্ছা, অলোকবাবু গাইছেন না কেন?"

জয়া ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "তোমার এত যদি মাথাব্যথা, যাও, গিয়ে শুনে এসো—কেন উনি গাইছেন না!"

কৌতুকের হাসি হেসে কল্যাণ বললে, "ও! এত বিরাগ ওঁর ওপর তা জানতাম না। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত—"

ভ্রুকুটি ক'রে জয়া বললে, "এ কথার মানে?"

"মানে আবার কি? এমনি বললাম।"

অধৈর্য সুরে জয়া ব'লে উঠল, "বলতেই হবে তোমার এ কথার অর্থ কি?"

"কিছুই নয়।" ব'লে কল্যাণ উঠতে উদ্যত হোল।

"কিছুতেই ছাড়ব না তোমায়।" ব'লে জয়া কল্যাণের হাত ধ'রে জোর ক'রে বসিয়ে দিলে।

তখুনি চোখ পড়ল জয়ার অদূরে দণ্ডায়মান ছোটকুমারের ওপর। কল্যাণ বললে, "আরে অলোকবাবু যে, আসুন, আসুন। দূরে দাঁড়িয়ে কেন?"

ছোটকুমার শুষ্ক স্বরে বললে, "মাথাটা টিপ টিপ করছে, তাই ভাবলাম—একটু বাইরে বেড়াই; কখন যে এপাশে এসে পড়েছি তা খেয়াল করি নি। কিছু মনে করবেন না। ক্ষমা করবেন আমাকে। আপনাদের বিশ্রম্ভালাপের সময় এভাবে এসে পড়া খুবই অন্যায় হয়েছে আমার।"

লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে কল্যাণ বললে, "বিশ্রাম আর আলাপ সবার সঙ্গেই হতে পারে, আসুন অলোকবাবু।"

"আপনি বারে বারে ডাকছেন। আপনি তো একা নন। মিস মিত্রের হয়তো অসুবিধে হতে পারে।"

এত বড় অনুযোগেরও কোন উত্তর না দিয়েই জয়া ক্রুদ্ধ ভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিলে। কল্যাণ আশ্চর্য হ'য়ে গেল জয়ার ব্যবহারে। জয়াদি কি সামান্য ভদ্রতাও ভুলে গেছে নাকি? অলোকবাবুকে ডেকে কি বসানো

উচিত তার? মনের ভাব চেপে কল্যাণ বললে, "কিছু অসুবিধে হবে না, বসুন আপনি।"

অগত্যা ছোটকুমারকে অন্তত কয়েক মিনিটও বসতে হয়। শুধু বসা নয়, কয়েকটি কথাও বলতে হয়। কিন্তু মনের যা অবস্থা তাতে এক সেকেণ্ডও থাকতে ইচ্ছা হয় না। ইচ্ছে না থাকলেও ভদ্রতার জন্যেও অলোক একটু ব'সে দু-একটি কথা ব'লে চ'লে গেল।

২৫

রাত্রি প্রায় দুটো। বিছানায় ছটফট করছে অলোক। কিছুতেই ঘুম আসছে না তার। মাথা গরম হয়ে গেছে। সন্ধ্যের সেই কথাটি তার কানে গুন গুন করছে—"কিছুতেই ছাড়ব না তোমায়।" আর সেই দৃশ্যটি চোখে ভাসছে—হাত ধ'রে জোর ক'রে বসিয়ে দিলে জয়া কল্যাণকে তার কাছে। বলেছে জয়া, তাতে দোষ কি? আর বসিয়েছে তাতে অন্যায়ই বা কোথায়? অলোক চোখ রাঙালে নিজেকে, বারে বারে ধমকালে মনকে। কিন্তু অবাধ্য মন ঘুরে ফিরে একই চিন্তা করে। অবাধ্য চোখ ঘুরে ফিরে একই দৃশ্য দেখে। অলোক বিছানা থেকে উঠে মাথায় খানিকটা ঠাণ্ডা জল চাপড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করলে, বাজে চিন্তা আর সে করবে না। কল্যাণের সঙ্গে জয়ার সম্বন্ধের কথা সে বুঝতেই পেরেছে। কলকাতার মিটিংওয়ালা মেয়ে কি ব'সে থাকে মা-বাপের মুখ চেয়ে? নিজের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে।

সেই রাত্রে জয়ারও ঘুম নেই কেন? কল্যাণকে হিংসে করে কেন অলোক-বাবু? সন্ধ্যের কথাটা কি সুরুচিপূর্ণ কথা বলা যায়? মাথা টিপটিপ ওসব বাজে ছলনা। তারা যায় নি ব'লেই দেখতে এসেছিলেন। অলোকবাবু কি তাকে—? না না, তা হতেই পারে না। চিরকাল সে ঘৃণা করে

পুঁজিপতিদের। যাদের আর কোন কাজ নেই, কেবল ব্যাঙ্কে টাকা বাড়ানো ছাড়া—তাদের ঘরে বধূ হয়ে যাবে সে? এর চেয়ে অসঙ্গত আর কিছু হতে পারে? অসঙ্গত তো নিশ্চয়ই। কিন্তু জগতে কি সব কিছু সঙ্গতই ঘটে? তার অবচেতন মন কি চায়? সে অলোককে চায় না তো? শিউরে উঠল জয়া। গভীর রাত্রিতে নির্জন ঘরেই লজ্জায় কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। পর-মুহূর্তেই সামলে নিয়ে দৃঢ়ভাবে বললে—মনে মনে চাইলেই হয় না। সে মনের বশীভূত? না, মন তার বশীভূত? তার আজন্মের আদর্শকে এভাবে নষ্ট করতে পারবে না—পারবে না—পারবে না।

এত প্রতিজ্ঞার পরেও জয়ার অন্যমনস্কতা গেল না। আর কারুর চোখে না পড়লেও কল্যাণের চোখে পড়ল বিশেষভাবে। কিন্তু করবার তার কি আছে? জমিদার-বাড়ীর কিংবা অলোকের কথা তুললেই তাকে থামিয়ে দেয় জয়া। কাজেই চুপচাপ থাকা ছাড়া উপায় নেই। একদিন চায়ের টেবিলে কল্যাণ বললে, "জয়াদি, টাকার অভাবে সেবকসঙ্ঘ একেবারে অচল। দেশের এই দুর্দিনে কে চাঁদা দেবে? সভ্যরা তো বেশীর ভাগই বেকার। এভাবে কি কোন প্রতিষ্ঠান চলে?"

জয়া বললে, "আমার সমিতিরও ঠিক একই অবস্থা। টাকার জন্যে কোন কাজই ভালো ক'রে চলছে না। বস্তির কাজগুলো প্রায় বন্ধ বললেই হয়। কি যে করি ভেবে পাই না।"

"আমার এক-একবার কি মনে হয় জান জয়াদি?"

"কি মনে হয় কল্যাণ?"

"মনে হয়—" ঢোক গিলে কল্যাণ আমতা আমতা করতে লাগল।

অধৈর্যভাবে জয়া বললে, "বলই না, কি মনে হয়! তোমার প্ল্যানটা শুনি, যদি যুৎসই হয়, তবে প্ল্যানটা আমিও নেব।"

কল্যাণ হেসে বললে, "আমার প্ল্যান তুমি নেবে?"

"ভালো হ'লে নেব না কেন?"

"আমার মনে হয়, যদি কোন বড়লোকের মেয়ে পেতাম যে বেশ টাকা পয়সা নিয়ে আসত, তাহ'লে বিয়ে করতাম।"

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ কল্যাণ, তোমার এত অধঃপতন আমি কল্পনাতেও কখনও আনি নি। তোমার সেবকসঙ্ঘ ম'রে যাক, তবুও যা বললে তা আর মুখে এনো না।"

কল্যাণ বললে, "তোমার মত আমার ধনীবিভীষিকা নেই। বড়লোকের টাকা ছাড়া কোন কাজই চলতে পারে না। কতকগুলো গরীব পৃথিবীর কি উপকারে লাগে? সমাজ-সেবাই বল, দেশ-সেবাই বল, দরিদ্রনারায়ণ-সেবাই বল—সবটাতেই দরকার টাকার। সৎকাজে টাকা চিরকাল ধনীরাই দিয়ে আসছে।"

জয়া বললে, "ওরে বাবা, তুমি যে বড়লোকের প্রশস্তি আরম্ভ করলে!"

"তোমার ভুল ভাঙাবার জন্যে। নিজের উপর বিশ্বাস আর আদর্শে আস্থা থাকলে শত প্রতিকূল অবস্থাতেও কেউ কখনও আদর্শচ্যুত হয় না। বরং টাকা পেলে সে এগিয়ে যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়চেতা ও আদর্শে নিষ্ঠা।"

কল্যাণের কথায় জয়ার একটা দিক অনেকটা হাল্কা হোল।

কল্যাণের যাবার মাত্র চার দিন বাকি। কল্যাণ সন্ধ্যেবেলা জমিদারদের আসরে নিয়মিত যায়। কোন কোন দিন জয়াও সঙ্গে থাকে। সেদিন জয়া বায়না ধরলে, সে তার সঙ্গে অন্তত চার-পাঁচ দিনের জন্যে হ'লেও কলকাতা যাবে।

কল্যাণ বললে, "চার-পাঁচ দিনের জন্যে গিয়ে লাভ কি?"

"লাভ ক্ষতি বুঝি না, দিন কতক না ঘুরে এলে আমার মন টিকবে না।"

"মনকে শাসন কর। এখন তোমার যাওয়া হতে পারে না, আর আমার সঙ্গে তো নয়ই।"

এমন সময় জয়ার মা এলেন ঘরে। তাঁকে দেখে কল্যাণ বললে, "দেখুন তো মাসীমা, জয়াদি আমার সঙ্গে কলকাতা যাবে ব'লে বায়না ধরেছে। কি অন্যায়!"

জয়া বললে, "মা, মাত্র চার-পাঁচ দিন, রাজগীরে কিছুতেই মন টিকছে না।"

গৃহিণী বললেন, "আমরাও তো চ'লে যাব। শুধু শুধু কলকাতায় চার-পাঁচ দিনের জন্যে গিয়ে লাভ কি?"

"আমাদের যেতে সেই ফাল্গুন-চোত। অনেক দেরী। একটু ঘুরে আসি মা, তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বোলো। লক্ষ্মীটি মা, অমত কোরো না।"

রায়বাহাদুর শুনে রেগে উঠলেন। তারপর প্রবল আপত্তির সুরে বললেন, "না না, এ হ'তেই পারে না, অতবড় মেয়ে একা একা কল্যাণের সঙ্গে গেলে কি ভাববে জমিদার-বাড়ী?"

গৃহিণী বললেন, "জয়াকে তুমিই বারণ কর। ডেকে দিচ্ছি আমি।"

রায়বাহাদুর বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুমিই বুঝিয়ে বল তাকে। এ সব মায়েরই কাজ। যদি নেহাত না কথা শোনে, দিন কয়েক পর না হয় সরকার মশায়ের সঙ্গে ঘুরে আসবে।"

মনে মনে ভাবলেন, বুকের ব্যথা বেড়েছে ভান ক'রে শুয়ে থাকলে বোধ হয় জয়াকে থামানো যায়। কিন্তু যখন জয়া ডাক্তার ডেকে আনবে, তখন কি জবাব দেবেন?

এমন সময় জয়া এসে বললে, "বাবা, আমি মাত্র চার-পাঁচ দিনের জন্যে কলকাতা যাব।"

রায়বাহাদুর বললেন, "দু-চার দিনের জন্যে গিয়ে শরীর খারাপ করা ছাড়া আর কি লাভ হবে? আমি আসছে মাসেই চ'লে যাব। এ কটা দিন, লক্ষ্মী মা আমার, মন টিঁকিয়ে থাক।"

জয়া আবদারের সুরে বললে, "লক্ষ্মীটি বাবা, রাগ কোরো না। একটুও শরীর খারাপ হবে না, আমি একটু ঘুরে আসি।"

রায়বাহাদুর আর একবার মৃদুস্বরে আপত্তি করলেন, কিন্তু জয়া সে কথায় কানই দিলে না।

আপত্তি তুললে কল্যাণ, "না জয়াদি, আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া হতেই পারে না। নেহাত যদি যেতে চাও, তবে একাই যেও।"

জয়া অবাক হয়ে বললে, "এ কথা বলছ কেন? এর অর্থ কি?"

"আমার ভাবী বউ অসন্তুষ্ট হবে।"

জয়া আশ্চর্য হয়ে বললে, "তার মানে?"

"মানে পরিষ্কার। আমার ভাবী বউ তোমায় আমার সঙ্গে নাবতে দেখলে হিংসে করবে।"

"তোমার আবার বউ ঠিক হয়েছে নাকি?"

"হ্যাঁ, একটি বড়লোকের মেয়ে হাতে পেয়েছি। ঠিক করেছি, তাকে বিয়ে ক'রে আমার সেবকসঙ্ঘের উন্নতি করব। কয়েকটি দুঃস্থের উন্নতি হবে।"

ভ্রূকুটি ক'রে জয়া বললে, "যা বললে তা সত্যি? না, আমায় রাগাবার জন্যে আবোল-তাবোল বকছ?"

বিস্মিত সুরে কল্যাণ বললে, "আমি বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করলে তুমি রাগ করবে কেন? বরং যখন দেখবে ধনী কন্যাটির অন্তর-বাহির আমূল পরিবর্তন ক'রে দিয়েছি, তখন খুসী হয়ে উঠবে। আচ্ছা, ঠিক ক'রে বল তো জয়াদি, উঠবে না?"

"খুসী হবার কথা পরে। কিন্তু তুমি অমন কর্ম কোরো না। অনুতাপে অশান্তিতে পুড়ে মরবে।"

"যদি একটা মানুষকে পরিবর্তন করতে না পারলাম, তাহোলে মরাই আমার ভালো।"

"তাই মোরো, কিন্তু আমি শুনব না তোমার কথা। তোমার ভাবী অধিশ্বরী অলোকা রাগই করুক আর হিংসেই করুক আমি যাবই তোমার সঙ্গে। এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

কল্যাণ সহসা এ কথার উত্তর খুঁজে পেল না।

যাবার দিন চ'লে এলো। যাবার সময় জমিদার-বাড়ীর মেজোকুমার, ছোটকুমার, তার বন্ধু-বান্ধব সব চলল স্টেশনে। রায়বাহাদুর, গৃহিণী, সরকার মশায়ও গেলেন কল্যাণের সঙ্গে। জয়া কল্যাণের সঙ্গে ট্রেনে চ'ড়ে বসল। হুইসিল পড়তে ব্যস্ত হয়ে মেজোকুমার বললে, "মিস মিত্র, নেবে আসুন।"

জয়া হেসে বললে, "আমিও দিন কতকের জন্যে চললাম কলকাতায়।"

"ওঃ, তাই নাকি ? তা তো জানতাম না !"

ট্রেন একটু একটু তখন চলতে আরম্ভ হয়েছে। অলোক যথাসম্ভব নিজেকে দমন ক'রে বললে রায়বাহাদুরকে, "আমি একটু বাজার ঘুরে যাবো।"

অলোকের কথার অর্থ বুঝতে রায়বাহাদুরের দেরি হোল না। তিনি বললেন, "বেশ বাবা, বেশ, যাও একটু ঘুরে এসো। আমরা বাড়ীর দিকে চললাম।"

২৬

রায়বাহাদুর বাড়ীতে এসে ফেটে পড়লেন। সবচেয়ে বেশী রাগলেন গৃহিণীর উপর। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন তিনি, "এত ক'রে সব দিক ভেবে চিন্তে, বুদ্ধি ফিকির ক'রে সম্বন্ধটা প্রায় পাকা ক'রে আনলাম, দিলে তো সব নষ্ট ক'রে ? লক্ষ টাকা দিলেও অলোকের মত পাত্র পাবে না। জয়া চ'লে যেতে মুখের চেহারা দেখলে তো ? ওদের বাড়ীর কেউ জানত না, জয়া কল্যাণের সঙ্গে যাচ্ছে। তাহোলে অন্তত অলোক যেত না

স্টেশনে। ছিঃ, ওরা ভাবলে কি বল তো? মেয়ের ভবিষ্যৎটারও মাথা খেলে তুমি।"

গৃহিণী বিরক্ত হয়ে বললে, "আমি কি করব? বললাম তো—যাস নে। না কথা শুনলে আমি কি করতে পারি? তুমিও তো জোর ক'রে বারণ করলে না!"

"চিরকাল অবাধ্য হতে শিখিয়েছ, এখন সে শুনবে আমার কথা?"

"অবাধ্য হতে শিখিয়েছি আমি?"

"হ্যাঁ, তুমি। তুমিই এর জন্যে দায়ী। আমি চেয়েছিলাম কি ছেলে-মেয়ের কচি মাথায় পলিটিক্স ঢোকাতে? আমি চেয়েছিলাম কি দিনরাত বাইরে দলবল নিয়ে হৈ-হৈ করতে? আমি চেয়েছিলাম জয়াকে কো-এডুকেশন দিতে? ম্যাট্রিকের পর বিয়ে দেবার কথা তোমায় বলি নি? যা চেয়েছি আমি, জব্দ করবার জন্যে ঠিক উল্টো করেছ। এখন আর মানবে কেন তারা আমার কথা?"

গৃহিণী আনত বদনে স্বামীর সব অনুযোগ শুনে গেলেন, কোনও জবাব দিলেন না। মনে মনে ভাবলেন তিনি, অলোকের সঙ্গে জয়ার মনের মিল হবে কি? আদর্শবাদী মেয়ে তাঁর, আর জমিদারের ছেলে অলোক—দুজনের মনের মিলন কি সম্ভব? না হওয়াই স্বাভাবিক। স্বামীর সঙ্গে অমিল, অথচ করতে হবে ঘর! গৃহিণী শিউরে উঠলেন। নিঃসঙ্গ, একক জীবনের বোঝা যে কতদূর দুর্বিষহ তা তিনি ভালো ক'রেই জানেন। বুকের ক্ষত চেপে, চোখের অশ্রু গোপন ক'রে, হাসিমুখে চলতে হবে সংসার-মরুতে দিনের পর দিন।

অশ্রু মুছাবার কেউ থাকবে না, মনের কথা বলবার লোক পাবে না,—মৃত্যু পর্যন্ত একটানা দীর্ঘনিশ্বাস আর অশ্রুজলের মধ্যে দিন কাটাতে হবে। না না, এ তিনি হতে দেবেন না। এর চেয়ে বিয়ে না হওয়া ঢের ভালো। ভালোই করেছে জয়া কল্যাণের সঙ্গে গিয়ে। এতে অলোক রাগ করে করুক।

দিন সাতেক পরে জয়া ফিরে এলো। রায়বাহাদুর ক'দিন অভিমান ক'রে কথাই কইলেন না। জয়া বললে চুপিচুপি মাকে, "বাবা খুব রাগ করেছেন, নয় মা ?"

"হ্যাঁ, তা করেছেন।"

"হার্টের অসুখ বেড়েছিল নাকি ?"

"না, তা বাড়ে নি।"

সন্ধ্যের সময় বাড়ীর সবাই গেছেন জমিদার-বাড়ী। জয়া ঘরে ব'সে জানলা দিয়ে পাহাড়ের দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে আছে। কাছে ব'সে হিন্দুস্থানী দাইটা বক্‌বক্ ক'রে কথা ব'লে চলেছে। ওবাড়ীর গান-বাজনার রেশও ভেসে আসছে। এমন সময় অলোক দরজার সামনে এসে বললে, "আসতে পারি ?"

জয়া তাকিয়ে দেখলে, অলোক সামনে দাঁড়িয়ে। বললে, "আসুন অলোকবাবু, বসুন।" ব'লে পাশের চেয়ার দেখিয়ে দিলে। তারপর বললে, "গানের আসর থেকে চ'লে এলেন যে ?"

"মন বসল না। ভাবলাম মিস মিত্র কলকাতা থেকে এসেছেন, শুনে আসি সেখানকার খবর। জানতে এলাম। অন্যায় হয়েছে আমার ?"

জয়া হেসে বললে, "অন্যায় ? না না, তবে আপনাদের বাড়ীতে এটা—" ব'লে জয়া চুপ ক'রে গেল।

অসমাপ্ত কথার জের টেনে অলোক বললে, "ভালো চোখে দেখবেন না— এই বলতে চান তো ?"

"কতকটা তাই।"

"তা হয়তো দেখবে না, কিন্তু আমারও তো স্বাধীন চোখ আছে, আমি তো অন্যরকম ক'রে দেখতে পারি।"

জয়া নিস্পৃহ সুরে বললে, "ভালো ছেলের তো বাড়ীর মত নিয়েই চলা-ফেরা দরকার। বাপ মা দাদা বৌদি—সব গুরুজনদের মতে মত মিলিয়ে থাকাই উচিত।"

"সংসারে সব উচিত কাজ কি মানুষ করতে পারে ?"

"ইচ্ছে থাকলে পারে বৈকি।"

"আপনি কি আপনার মা-বাপের কথামতো চলেন ?"

"আমার কথা বাদ দিন। আমি তো ভালোর শ্রেণীতে পড়ি না।"

"মন্দই বা কিসে ? আপনাকে তো আমাদের বাড়ীর সকলে খুব পছন্দ করে।"

জয়া চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললে, "আ-মা-কে ?"

"হ্যাঁ, আপনাকে। অবাক হয়ে গেলেন যে ? ভালো মেয়েকে সকলেরই ভালো লাগে।'

"আমি কি ভালো মেয়ে ? মিটিং করি, বস্তিতে ঘুরি, ছেলেদের সঙ্গে মিশি, শুধু কি কল্যাণ ? ছেলে-বন্ধু আমার বহু আছে।" ব'লে একবার আড়-চোখে অলোকের মুখের দিকে চেয়ে নিলে।

অলোক উৎসাহ দেখিয়ে বললে, "তাই নাকি, অনেক আছে ? শুনে খুসী হলাম।"

"আপনার বাড়ীতে তো আছে।'

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে অলোক বললে, "যাক গে ওসব কথা। যার জন্যে এলাম, তার কথাই হোল না। কি দেখে এলেন বলুন ?"

"কি শুনতে চান আপনি, আমি তো বুঝতে পারছি না। কি আর দেখব! যে কদিন ছিলাম সমিতি আর বস্তি ক'রে ঘুরেছি। অন্য কিছু দেখবার তো ফুরসুৎ হয় নি আর প্রবৃত্তিও ছিল না।"

অপ্রস্তুত স্বরে অলোক বললে, "আপনি কি সিনেমা দেখেন না ?"

"দেখি না—এ কথা বলতে পারি না। তবে খুব কম দেখি। ভালো বই এলে দু'একটা দেখি বৈকি।"

"আপনাদের সমিতির কাজকর্ম চলছে কেমন ?"

"বিশেষ ভালো নয়। যে রকম টাকার টানাটানি, এতে কি ভালো কাজ চলতে পারে ? বস্তি, নাইট স্কুল সবই এক রকম।"

"চাঁদা তোলেন না আপনারা ?"

"নিশ্চয়ই তুলি। তবে দেশের যা অবস্থা, চাঁদা কে দেবে বলুন ? মধ্যবিত্তরাই তো টাকা দিয়ে দুঃস্থ প্রতিষ্ঠানগুলো বাঁচিয়ে রাখেন, তাঁদেরই আজ নিজেদের বেঁচে থাকা এক সমস্যা। কোত্থেকে দেবেন তাঁরা বলুন ?"

"বস্তিতে আপনারা কি কাজ করেন ?"

"বস্তি যাতে পরিষ্কার থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা ; স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া ; ঝগড়া-ঝাটি মারপিট যাতে না ক'রে তার ব্যবস্থা করা ; ওদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাছাড়া যখন যে সমস্যা দেখা দেয় তার সমাধানের চেষ্টা করা।"

"কলকাতার কটা বস্তিতে আপনারা কাজ করেন ?"

"আট-দশটা বস্তিতে আমাদের কর্মীরা কাজ করেন।"

"সব কটাতেই নাইট স্কুলের ব্যবস্থা আছে ?"

"হ্যাঁ, তা আছে।"

"আপনি পড়ান ?"

"হ্যাঁ।"

এবার জয়া হেসে বললে, "আপনি যে কেবল প্রশ্ন করছেন ! এ সবে আপনার ইন্‌টারেস্ট আছে নাকি ?"

"তা আছে একটু একটু। সুযোগ পেলে ওদের সেবা করতে আমার ইচ্ছে হয়।"

"আপনার ইচ্ছে হয় ?" জয়া অবাক হয়ে চেয়ে রইল অলোকের দিকে।

"আপনি এত আশ্চর্য হচ্ছেন কেন ? দুঃস্থের সেবা বুঝি আপনাদেরই একচেটিয়া ? তাতে আর কারুর অধিকার নেই ?"

"না না, তা কেন ভাবব ? তবে—"

অলোক জয়ার কথার জের টেনে বললে, "তবে আমাদের মুখে ওসব ভূতের মুখে রাম নামের মত, নয় কি ?"

"অন্তত আমার ধারণা তো তাই ছিল।"

"আপনার সব ধারণাই যে ঠিক নয়, তা এখন মনে হচ্ছে কি ?"

জয়া হেসে বললে, "একটু একটু।"

এর পর থেকে অলোকের কুণ্ঠা দূর হয়ে গেল। দিনের অধিকাংশ সময়ই জয়ার সঙ্গে গল্প করে, বেড়াতে যায়। রায়বাহাদুর আনন্দে গদগদ হয়ে গেলেন। ভাবলেন, আরও কিছুদিন গেলে জমিদারবাবুর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করবেন। কিন্তু খুসী হতে পারলেন না গৃহিণী। দুরুদুরু বুকে ভাবতে লাগলেন, দুটি বিপরীত মুখ মন কি একমুখ কখনও হতে পারে ? প্রচণ্ড ঘা খেয়ে ছিটকে পড়াই সম্ভব। যে দুঃখে তিনি দুঃখী, মেয়েও কি সেই দুঃখের পথে পা বাড়াবে চিরকালের জন্যে ?

জয়াও ভাবে অনেক কথা। অলোক কি সত্যিই দুঃস্থের সেবা করতে চায় ? না, এটা বড়লোকের খেয়াল মাত্র ? না, তাকে সুখী করবার জন্যে কপট সহানুভূতি ? তাকে খুসী করতেই বা চায় কেন ? তার প্রত্যেক কথায় সায় দিয়ে যায় কেন ? তবে কি ?—তারও মন অহরহ ওর সঙ্গই কামনা করে ! অন্য দিকে ঘুরোবার চেষ্টা করলেও কম্পাসের কাঁটার মতো ওর দিকেই তো ঘুরে দাঁড়ায় ! এ রকম তো হওয়া উচিত নয়। অলোককে বিয়ে করা মানে জীবনব্যাপী সংগ্রামের সম্মুখীন হওয়া।

কিন্তু তার মন চায় ওকে। সে কি সংগ্রামের ভয়ে পিছিয়ে পড়বে ? কল্যাণ বলেছিল, যথার্থই কারুর যদি আদর্শে নিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস আর মনের দৃঢ়তা থাকে তবে আর একজনকেও ঐ ভাবে গ'ড়ে তোলা যায়। নিশ্চয়ই যায়। কেন যাবে না ? কল্যাণ ঠিক বলেছে। সে অলোককে নিজের মতো ক'রে গ'ড়ে তুলবে। ঐ টাকায় দেশের ও দশের সেবায় দুজনে জীবন উৎসর্গ করবে। হঠাৎ একটি প্রশ্ন উদয় হলো জয়ার মনে। তার মা তো পারেন নি বাবাকে নিজের আদর্শে আনতে ? তার দাদামশায়ও পারেন নি দিদিমাকে। তবে ? না না, ওসব চিন্তা আর সে করবে না।

করা উচিতও নয়। ভুল পথে সে পা বাড়াবে না বাড়াবে না, বাড়াবে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে আবার জয়া।

অলোক বেচারাও দিনরাত মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে করতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। দুর্জ্ঞের রহস্যে ভরা ঐ মেয়েটিকে একান্ত নিজের করবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আবার পর-মুহূর্তেই নিরাশার গভীর অন্ধকারে ডুবে যায়। জয়া হয়তো কল্যাণকেই ভালোবাসে। সে নিজের চোখে যা দেখেছে আর নিজের কানে যা শুনেছে তা তো অবিশ্বাস করতে পারবে না। তাছাড়া কোন কাজ নেই, শুধু শুধু কল্যাণের সঙ্গে কলকাতা যাওয়া, তাকে চিঠি লিখে আনানো—এসব কি ভালোবাসার লক্ষণ নয়? কেন শুধু শুধু সে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে? ও সব আশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

২৭

মনের নিভৃত স্তরে বাসনা বুঝি এমনি ক'রেই নিজের ব্যূহ রচনা করে। এমনি ক'রেই বুঝি অতর্কিতে একদিন বিজয় অভিযানের উদ্যোগ সুরু হয়ে যায়। কিন্তু মনের আর এক কোণে একটি তাজা সন্দেহ জয়াকে নিরুদ্যম ক'রে দেয়। সে কি পারবে অলোককে তার পথে চালাতে? আর অলোক ভাবে, সে কি পারবে জয়াকে ছিনিয়ে নিতে কল্যাণের কাছ থেকে?

সেদিন সন্ধ্যের সময় বৌরাণীরা জয়াদের বাড়ীতে বেড়াতে এল। বললে তারা, "কি গো জয়ারাণী, আমাদের যে একেবারে বয়কট করলে! কি কর একা একা বাড়ীতে ব'সে?"

স্মিতহাস্যে জয়া বললে, "কি আর করব, এমনি ব'সে থাকি।"

"কেন যাও না আমাদের বাড়ী? ভালো লাগে না? একা ব'সে থাকতে খুব ভালো লাগে, নয়?"

বড় জাকে থামিয়ে মেজো বৌরাণী বললে, "একা থাকবে কেন, ঠাকুরপো থাকেন, তাঁকে ছেড়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগতেই পারে না।"

জয়া লজ্জিতসুরে বললে, "ওসব বাজে কথা বলবেন না।"

"বাজে কথা নয় গো, বাজে কথা নয়। এর চেয়ে কাজের কথা দুনিয়ায় কিছু আছে ?"

জয়া দৃঢ়স্বরে বললে, "সবার কাছে নয়। আর এ সব কথা কখনও আমার কাছে বলবেন না। আর শুনে রাখুন, যা ভাবছেন তা হতেই পারে না।"

বড় বৌরাণী বিস্মিতস্বরে বললে, "কেন, ঠাকুরপোকে তোমার পছন্দ হয় না ?"

"অপছন্দ হবে কেন ? পছন্দ না হ'লে কি কেউ কারুর সঙ্গে মিশতে পারে ? না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে পারে ? একটি পুরুষকে পছন্দ হওয়া মানেই যে তাকে বিয়ে করতে হবে—এ আমি মোটেই ভাবি না। আপনার ঠাকুরপো একজন শিল্পী। তাঁর গান গাওয়া, ছবি আঁকা আমার খুব ভালো লাগে, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি, ব্যস্ এখানেই শেষ।" তারপর একটু চুপ ক'রে আবার বললে, "আপনাদের বাড়ীতে যিনি বৌরাণী হয়ে আসবেন তিনি ঠিক আপনাদের উপযুক্ত হয়েই আসবেন। আমি হলাম অন্য প্রকৃতির। আমার রীতি, নীতি, মতি, গতি আপনাদের থেকে একেবারে ভিন্ন। ওসব কথাই বা আপনাদের মনে আসে কেন ?"

জয়ার কথাগুলি ঘুরে ফিরে অতিরঞ্জিত হয়ে অলোকের কানে পেঁছিল। অলোক এতে দুঃখিত হোলেও আশ্চর্য হোল না। কারণ সে তো জানেই জয়ার কাকে পছন্দ। তাছাড়া জয়া বিদুষী, এম. এ., আর সে মাত্র আই. এ. পর্যন্ত পড়েছে। তার ওকে আশা করাও বাতুলতা। মনকে বারে বারে শাসন করে অলোক। কিন্তু অবাধ্য মন শাসন মানে না। শেষে 'যা হবার হোক' ব'লে হাল ছেড়ে দেয় ছোটকুমার।

যেমন চলছিল, চলতেই লাগল দুজনের গল্প-গুজব বেড়ানো। রায়-বাহাদুর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন গৃহিণীকে, "দেখেছ আজকাল জয়ার ভাবটা কেমন! সেই উগ্র ধারণা, বড়লোক সম্বন্ধে উগ্র কথাবার্তা অনেক

ক'য়ে গেছে। জমিদার-বাড়ী সম্বন্ধে যে উপহাসের ভাব ছিল তা আর নেই। অলোকের ত্রিসীমানায় আগে যেত না। এখন সব সময় দুজনে পাশাপাশি থাকে। ভাবছি—এবার কথাটা পাড়ব।"

ব্যস্ত হয়ে গৃহিণী বললেন, "এখনই কথাটা পেড়ো না, আর একটু অপেক্ষা কর। দেখ কি হয়? এখন জয়ার কোন সঙ্গী নেই, তাই হয়তো সময় কাটাবার জন্যে অলোকের সঙ্গে মিশছে। তা ছাড়া ওর ছবি আর গানের ভক্ত জয়া খুব। ঠিকমতো না বুঝে আগে কথা পাড়া ভালো নয়। গরম প'ড়ে এলো। চল কলকাতায় যাই, সেখানে গেলে বোঝা যাবে জয়ার মনের কথা। আর আমার মনে হয়, যদি ওদের ভাবই হয়ে থাকে, আগে অলোককে প্রস্তাব করতে দাও। প্রথমে তোমার প্রস্তাব করা উচিত নয়।"

আশ্চর্য হয়ে রায়বাহাদুর বললেন, "তোমার ওসব যুক্তি রেখে দাও। মেয়ের বাপ প্রস্তাব করবে না তো করবে কে প্রথমে?"

"ওদের মনের ভাব না বুঝেই কি ক'রে প্রস্তাব করবে তুমি? গল্প করলেই ভাব হয় কাদের? যারা কখনও কোন ছেলের মুখ দেখতে পায় না। প্রস্তাব করবার পর দুজনের একজন যদি বেঁকে বসে? তখন কি করবে? এ সব কাজে এত তাড়াতাড়ি করতে হয়?"

ফাল্গুনের মাঝামাঝি। ভীষণ গরম প'ড়ে গেল রাজগীরে। ফাল্গুনের প্রথম দিকেই সব চেঞ্জার চ'লে গেছেন। বাকি যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও পাততাড়ি গুটোলে রাজগীর একবারে ফাঁকা হয়ে গেল। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনবিরল রাজগীর খাঁ-খাঁ করতে থাকে। সূর্যতেজে সমস্ত রাজগীর উত্তপ্ত। বেরোনো দুঃসাধ্য।

রায়বাহাদুর বললেন, "এবার তল্পী গুটোতে হয়।"

জমিদারবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই। চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক্।"

অলোকের মুখে খবরটা শুনে জয়া আনন্দে ব'লে উঠল, "বাঁচলাম। কলকাতা যাওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। সব ছেড়ে এখানে অলস হয়ে থাকা কি ভালো লাগে?"

অলোক বললে, "কলকাতায় গেলে দেখা পাব তো ?"

"পাবেন, তবে কম।"

এক হপ্তার মধ্যেই সবাই কলকাতায় এসে হাজির হোল। জয়াদের বাড়ী টালিগঞ্জ আর অলোকের শ্যামপুকুর। কলকাতার এ-প্রান্ত আর ও-প্রান্ত। যেখানে মনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ সেখানে বাইরের দূরত্বে কি এসে যায় ? কাজেই কলকাতাতেও দুই পরিবারের যাতায়াত অবাধে চলতে লাগল, কেবল মুশকিল হোল জয়াকে নিয়ে। সে এক সময়ও বাড়ী থাকে না। সমিতি, বস্তি, নৈশ বিদ্যালয় নিয়ে একবারে মেতে উঠল। অলোক বেচারা আসে, কর্তা-গৃহিণীর সঙ্গে গল্প ক'রে চ'লে যায়। যার জন্যে আসা তার দেখা মেলে কদাচিত।

বাড়ীর সকলেই অলোকের আসার খবর দেয়। জয়া কিন্তু সে সব কথা কানে তোলে না। যেন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অলোকের আসাকে। ওকে দেখে এখন কেউ বলতে পারবে না যে, কয়দিন ঐ আলোকই ওর জীবনে আলোড়ন তুলেছিল। আলোড়ন তুলেছিল ব'লেই তো সে ভুলতে চায় ওকে। যার সঙ্গে মিলনে সমস্ত জীবন ওলটপালট হয়ে যেতে পারে, সমস্ত আদর্শ ভেসে যেতে পারে তার কাছ থেকে কি দূরে থাকা উচিত নয় ?

রায়বাহাদুর বললেন স্ত্রীকে, "অলোক আসে আর জয়া কোনদিনই বাড়ীতে থাকে না। তুমি ওকে থাকতে বোলো। এখানে এসেই আরম্ভ হোল হৈ-চৈ। এদের দুহাত এক ক'রে না দিতে পারলে আর আমার স্বস্তি নেই।"

গৃহিণী মনে মনে হাসলেন। পুরুষের মুখে ঐরকম অবান্তর কথাই শোভা পায়। দুটো হাত এক ক'রে দেওয়াই যেন বড় কথা। দুটো মন যদি এক না হয় ? তখন কি স্বস্তি পাবেন তিনি ?

রায়বাহাদুর স্ত্রীকে চিন্তিত দেখে বললেন, "কি গো, চুপ ক'রে রইলে যে ?"

"চুপ ক'রে না থেকে উপায় কি ? দুহাত এক ক'রে দিলেই কি দুটো মন এক হয় ? বেশ তো, জয়া কাজে কর্মে আছে, তাই ওকে করতে দাও। ওর যদি টান থাকে অলোকের ওপর, নিজেই থাকবে বাড়ীতে।" তারপর হঠাৎ হাত জোড় ক'রে মিনতির স্বরে স্বামীকে বললেন, "ব্যস্ত হ'য়ে দুটো জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দিও না ! জয়া যদি চিরকাল কুমারী থাকে সেও ভালো, তবু সর্বাঙ্গে সৌভাগ্যের চিহ্ন এঁকে তাকে চরমতম দুর্ভাগ্যের বোঝা ব'য়ে বেড়াতে যেন না হয়। মুখে হাসি আর বুকে হাহাকার পুষে চিরদিন তাকে স্ত্রীর অভিনয় যেন করতে না হয়।" কথাগুলি ব'লেই ঝরঝর ক'রে তিনি কেঁদে ফেললেন।

কর্তা বেদনাপূর্ণ নয়নে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইলেন। ব্যথাহত চিত্তে চিন্তা করলেন তিনি, গৃহিণী ঠিকই বলেছেন ; মিলনের অভিশাপ জয়াকে আমার যেন বহন করতে না হয়, নদীর ধারে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণায় যেন তার ছাতি ফেটে না যায়। সোনার খাটে আরাম শয্যায় চোখের জলে ভাসতে যেন না হয়। যে আগুনে তাঁরা দগ্ধ হচ্ছেন, সেই আগুনেই জয়াকে ঠেলে দিতে চান ? বারে বারে প্রশ্ন করেন রায়বাহাদুর নিজের মনকে। না, তিনি কিছু বলবেন না আর জয়ার বিয়ে সম্বন্ধে, ব্যস্তও হবেন না। অসীম করুণাময় ভগবানের উপর সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবেন। যা হয় রঘুনাথ করবেন।

২৮

রায়বাহাদুর সত্যিই রঘুনাথের উপর সব ছেড়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে লাগলেন। তিনি তো নিশ্চিন্ত হলেন, কিন্তু অলোক ভয়ানক অস্থির হয়ে পড়ল। মাসের পর মাস যাচ্ছে চলে, জয়ার মনের নাগালই পাওয়া গেল না। যা হয় একটা হোক, এভাবে কি থাকা যায় দিনের পর দিন ? সে তো জানেই জয়ার মন রয়েছে বাঁধা আর একজনের সঙ্গে। তবুও

অনুমানে ভর ক'রে সে চ'লে যেতে চায় না। কাজেই কথাটা একবার পাড়া দরকার। কথা পাড়বে কার কাছে? জয়া তো এক সময়ও বাড়ীতে থাকে না। খুব ভোরে গেলে ধরা যায় কিংবা থাকবার জন্যে অনুরোধ ক'রে আগে থেকে জানিয়ে গেলে হয়। কি করবে সে? টেলিফোন করবে জয়াকে দেখা করতে চায় ব'লে? না, তা হয় না, সকলেই জেনে ফেলবে। তার চেয়ে এক কাজ করলে হয়। সমিতির ঠিকানায় একটা চিঠি দেবে যে, কখন তার সঙ্গে দেখা হতে পারে? এটাই সব চেয়ে ভালো উপায়। কেউ জানতে পারবে না।

দু-দিন দিনের মধ্যেই জয়া চিঠি পেলো অলোকের কাছ থেকে—সে দেখা করতে চায় তার সঙ্গে, গুটি কয়েক কথা বলতে চায়। কি কথা? জয়ার মুখ লাল হয়ে গেল। বুক দুরু দুরু করতে সুরু করল। মনে অস্বস্তি হতে লাগল। কারুকে কথাটা না ব'লে স্থির থাকতে পারছিল না জয়া। কাকে বলতে পারে সে? কল্যাণ তার চিরদিনের সুহৃদ, বন্ধু, তার কাছেই ছুটল জয়া। বললে তাকে, "কল্যাণ, তুমি বড়লোকের মেয়ে বিয়ে ক'রে তোমার সঙ্ঘের উন্নতি করবে বলেছিলে, মনে আছে তোমার?"

"নিশ্চয়ই আছে। একটি তো জুটেও ছিল, কিন্তু কপালগুণে হাত-ফস্কে গেল।"

"আমার যদি জোটে কল্যাণ, করব বিয়ে? তোমার মত কি?"

আনন্দে উপছে উঠল কল্যাণ, "নিশ্চয়ই করবে। আমার সম্পূর্ণ মত আছে জয়াদি।"

"কিন্তু বড়লোকটির সঙ্গে যে আমার আদর্শের আকাশ-পাতাল তফাত ভাই।"

"তোমার ভুল ধারণা জয়াদি। তোমাদের পরস্পর শ্রদ্ধা থাকলে এক আদর্শ হতে কতক্ষণ?"

"না কল্যাণ, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, দুটো বিভিন্নমুখী জীবন এক হয় না। তার উদাহরণ

আমার মা আর দিদিমা। পারলেন তাঁরা স্বামীদের মন ফেরাতে? না ভাই, দরকার নেই আমার টাকার। মনে সদিচ্ছা থাকলে চলবেই সমিতি। জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে পারব না।"

কল্যাণ দুঃখিত স্বরে বললে, "যা ভালো বোঝ তাই কোরো জয়াদি।"

জয়া অলোককে জানালে, সন্ধ্যেতে তার সঙ্গে দেখা হবে বাড়ীতে। সেদিন জয়া বিকেলেই বাড়ী ফিরল। বাড়ীর গৃহিণী এসব কিছু জানতেন না। জয়াকে তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে তাঁর ভয় হোল, শরীর খারাপ হয়েছে নাকি? বললেন, "কি রে, ভালো আছিস তো?"

বললে জয়া, "হ্যাঁ মা, ভালোই আছি।"

সন্ধ্যের সময় অলোক এসে হাজির। রায়বাহাদুর খুসীতে উছলে উঠলেন। জয়া বাড়ীতে আছে। বেচারী কোনদিন ওর দেখা পায় না। গৃহিণীকে বললেন, "আজ জয়ার হাতেই চা খাবার পাঠিয়ে দাও, আর ওদের গল্প করবার একটু সুযোগ ক'রে দিও।"

গৃহিণী বললেন, "বাড়াতে কেউ নেই। এমনিই সুযোগ আছে।"

"সুশীল, অনিল যেন অফিস থেকে এসে ওখানে না যায়।"

"আচ্ছা।" ব'লে গৃহিণী চায়ের ব্যবস্থা করতে চ'লে গেলেন।

নানা রকম গল্পগুজবের পর অলোক বললে, "যে জন্যে এসেছি, সে কথা কি নির্ভয়ে বলতে পারি?"

সংযত স্বরে জয়া বললে, "নিশ্চয়ই বলতে পারেন।"

"আশা করি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না? এত দিনের আলাপে এটুকু দাবি বোধ হয় করতে পারি?"

যথাসম্ভব নিজেকে দমন ক'রে জয়া বললে, "আপনার বক্তব্য না শুনে কথা তো দিতে পারি না।"

অনুরাগ ভরে উত্তর দিলে অলোক, "আমার বক্তব্য আজ—" ব'লে পকেট থেকে একটি ভাঁজ করা কাগজ বের ক'রে জয়ার হাতে দিয়ে বললে, "দয়া ক'রে এই অতি সামান্য—গ্রহণ করুন।"

জয়া খুলে দেখলে সেটি কাগজ নয়। তার নামে হাজার টাকার একটা চেক।

নীরস কণ্ঠে জয়া বললে, "আপনি কেন আমায় দিচ্ছেন এতগুলো টাকা? লোভে প'ড়ে যাব যে অলোকবাবু!"

জয়ার কথায় কুণ্ঠিত হয়ে গেল অলোক, "ছি ছি, কি বলছেন আপনি? এই সামান্য টাকায় আপনি লোভে পড়বেন? কেন এ কথা মনে করছেন? আমি আপনার নামে চেক দিয়েছি বটে, তবে টাকাটা দিচ্ছি বস্তির জন্যে। আপনি দুঃস্থের সেবা করেন মিস মিত্র। তাদের জন্যে চাঁদাও তোলেন জানি, সেই সাহসেই আমার এই দীন দান দুঃস্থের সেবায় আপনার হাতে তুলে দিলাম।"

জয়ার মনে হোল, এ দানের পেছনে অনেকখানি প্রত্যাশা অলোক রাখে। এ দান তার নিঃস্বার্থ নয়। তাকে ধরবার একটা ফাঁদ মাত্র। কিছুতেই সে এ ফাঁদে পা দেবে না।

জয়া বললে, "অলোকবাবু, আপনাকে ধন্যবাদের সঙ্গে চেকটি ফেরত দিলাম। আমার সমিতি বস্তির জন্যে আমরা চাঁদা তুলি ঠিকই, কিন্তু এখানি আমি নিতে পারলাম না। কেন পারলাম না— দয়া ক'রে জিজ্ঞেস করবেন না।" ব'লে চেকটি অলোকের কাছে রেখে দিল।

অপমানে লজ্জায় অলোকের মুখ কালো হয়ে গেল। অবনত বদনে কয়েক মিনিট চুপ ক'রে থেকে বিষণ্ণ স্বরে অলোক বললে, "যাঁরা সমাজ-সেবা করেন, তাঁরা পরের জন্যে নির্বিচারে সকলের কাছেই দান গ্রহণ করেন। চেনা অচেনা, যোগ্য অযোগ্য, উদ্দেশ্য অনুদ্দেশ্য—এসব কিছুই বিচার করেন না। এই কারণে আমি আপনাকে চেকটা দিতে সাহস করেছিলাম।" তারপর হাত জোড় ক'রে করুণ কণ্ঠে বললে, "অন্যায় হয়েছে আমার মিস মিত্র, ক্ষমা করবেন।" বলে চেকটি কুঁচি কুঁচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল অলোক।

২৯

অলোক চ'লে যেতে জয়া নিজের ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে কান্নায় ভেঙে পড়ল। ছিঃ ছিঃ, এ সে কি করলে? এত নিষ্ঠুরতা, এত অভদ্রতা কি ক'রে করলে সে অলোকের সঙ্গে? কেন তার এমন দুর্বুদ্ধি হোল? এমন ক'রে অপমান মানুষ শত্রুকেও করতে পারে না। অলোকের নিষ্প্রভ বেদনার্ত মুখ বারে বারে ঘা দিতে লাগল তার হৃদয়-পাষাণে। জয়া সারারাত্রি অনুতাপের দহনে দগ্ধ হতে লাগল। মনে হোল তার, এখুনি ছুটে যায় অলোকের কাছে, পায়ে ধ'রে ক্ষমা চায়—অন্যায় হয়েছে তার, ঘোরতর অন্যায়, এর চেয়ে অন্যায় আর হতে পারে না।

এদিকে অলোক টলতে টলতে কোন রকমে গাড়ীতে ব'সে শোফারকে হুকুম দিলে—লেকের দিকে যেতে। পেছনের সিটে সে হেলে প'ড়ে চোখ বন্ধ ক'রে রইল। বারে বারে জয়ার দৃপ্ত ভঙ্গী চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল, কানে বাজতে লাগল সংযত কথা—'ধন্যবাদের সঙ্গে চেকটি ফেরত দিলাম।' ধন্যবাদের সঙ্গে—বিদুষী মেয়ে বিষের ছুরি মিছরি কোটিং দিয়ে বুকে মারতে ওস্তাদ। এত তাচ্ছিল্য, এত উপেক্ষা মানুষ করতে পারে মানুষকে? সে জানত না, জয়াই তার চোখ খুলে দিয়েছে। লেকের ঝিরঝিরে বাতাসে অনেকটা শান্ত হোল অলোকের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক। জলের দিকে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞা করলে বারে বারে, আর কোনদিনই সে জয়ার সামনে যাবে না।

জয়ার মুখের অবস্থা দেখে গৃহিণী শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। জয়া এত অন্যমনস্ক, এত শুকনো কেন? কি হোল তার অলোকের সঙ্গে? একবার ভাবলেন, জিজ্ঞেস ক'রেই দেখা যাক; তার পরেই মনে হোল, থাক্‌গে, শোনবার মতো কথা হোলে ও নিজেই বলত।

জয়া নির্দয়ভাবে আঘাত করেছে অলোককে, তার প্রিয়তমকে। সে আঘাত শতগুণ বেশী হয়ে ফিরে আসে নি কি তার বুকে? কি করবে সে? এ ছাড়া যে তার আর অন্য উপায় ছিল না!

বেচারী জয়া দৈনন্দিন কাজ সবই করে, কিন্তু শান্তি নেই। বুকের ভেতর অসহ্য ব্যথা গুমরে গুমরে কেঁদে ফিরছে। এক-একবার বুক চেপে ব'সে থাকে জয়া নির্জনে।

দিন কয়েক কেটে গেল। দুজনের কেউ কারুর খোঁজ রাখে না। অন্তরে তাদের মহাবিপ্লব সুরু হোলেও বাইরে নীরব নিস্তব্ধ। কর্তার চোখ এড়োল না। বললেন ডেকে গৃহিণীকে, "অলোক সেদিন থেকে আসে না কেন? জয়াও যেন কেমন মনমরা হয়ে ঘুরছে! কি হোল ওদের? ঝগড়া হোল নাকি?"

গৃহিণী বললেন, "না না, ঝগড়া করবে কেন? হয়তো কোন কারণে আসতে পারছে না।"

"না না, তুমি অনিলকে ব'লে দাও, অফিস-ফেরতা যেন অলোকের খোঁজ নিয়ে আসে।"

গৃহিণী একটু চিন্তা ক'রে বললেন, "আবার অফিস-ফেরতা যাবার হাঙ্গামা কেন? ফোনে খোঁজ করলেই তো হয়।"

"বেশ, তাই কোরো।"

সেদিন গৃহিণী ফোনে খোঁজ নিলেন—সকলে কেমন আছে? একদিন অলোককে সুবিধে ক'রে আসতে বললেন।

দিন কয়েক পর কাগজ উল্টোতে উল্টোতে অলোকের হঠাৎ নজরে পড়ল একটা মিটিংয়ের বিজ্ঞাপন। স্থান—ওয়েলিংটন স্কোয়ার, বিষয়—হিন্দু কোড বিল, বক্তা—জয়া মিত্র এবং আরও অনেকে। তীব্র কৌতূহল জেগে উঠল অলোকের মনে। জয়া কি বলে, কেমন বলে—একবার শুনতে ইচ্ছে হোল তার। তা ছাড়া সে দিন তো জয়ার মা ফোনে তাকে বারে বারে ব'লে দিয়েছেন যেতে। হয়তো জয়ার তার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্যে অনুতাপ হয়েছে। দেখাই যাক মিটিংয়ে গিয়ে। তবে সে এমনভাবে সবার সঙ্গে মিশে থাকবে যে, দেখতে পাবে না জয়া।

ওয়েলিংটনের এক কোণে ব'সে শুনতে লাগল অলোক জয়ার বক্তৃতা। একটুও না থেমে প্রায় এক ঘণ্টা ব'লে গেল তার সুচিন্তিত ভাষণ। সুঠাম গঠনের দৃপ্ত ভঙ্গিমা অলোককে আবার পাগল ক'রে তুলল। তার মান অপমান আত্মসম্মান প্রতিজ্ঞা সব ভুলে সে ব'সে রইল এক কোণে। ভাবলে অলোক, ফুলের শ্রেষ্ঠ গোলাপ। তা তুলতে গেলে কাঁটার ঘা খেতে হয়। কাঁটার ভয়ে কি কেউ গোলাপ তোলে না? তার চেক না হয় ফিরিয়েই দিয়েছে, তাই ব'লে কাপুরুষের মতো স'রে আসবে সে?

রাত প্রায় আটটা। মিটিং ভেঙে গেল। সকলে হৈ-হৈ ক'রে পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়ল। কল্যাণের সামনে প'ড়ে গেল অলোক। কল্যাণের পেছনেই জয়া আরও কয়েকটি মেয়ে আর ছেলে।

কল্যাণ ব'লে উঠল, "আরে অলোকবাবু যে, কি ব্যাপার?"

থমকে দাঁড়ালো জয়া। তার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল অলোকের সেই বেদনাপূর্ণ রূপ। তার ক্ষমা চাওয়া দরকার। কিন্তু এখানে এত লোকের সামনে? কি ক'রে চাইবে সে ক্ষমা? আড়ালে ডাকবে কি অলোককে? না না, তা হতে পারে না।

কল্যাণ জয়ার অন্যমনস্কতা দেখে বললে, "কি ভাবছ জয়াদি? অলোকবাবু যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে—দেখতে পাচ্ছ না?"

অপ্রস্তুত স্বরে জয়া বললে, "দেখেছি। একটা অন্য কথা ভাবছিলাম। অলোকবাবু, ভালো আছেন? বাড়ীর সবাই?"

অলোক ঘাড় নেড়ে জানালে, সব ভালো। বললে, "আপনার বক্তৃতা খুব ভালো হয়েছে।"

জয়া তার সঙ্গের ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে বললে, "আর এদের বুঝি হয় নি? আপনি তো বেশ!"

"না না, ওঁদেরও হয়েছে।"

"তাই বলুন যে, আপনাদের সকলের হয়েছে।" ব'লে জয়া হেসে উঠল। তারপর হাত জোড় ক'রে নমস্কারের ভঙ্গীতে বললে, "আজ আসি

অলোকবাবু। আশা করি আবার দেখা হবে। চল কল্যাণ, তোমায় নামিয়ে দি।"

"আবার কেন আমার জন্যে গাড়ী ঘুরবে ?"

"তা হোক। ওঠ শিগগির।"

অলোক তার গাড়ী থেকে চকিতে দেখে নিলে, পাশাপাশি ব'সে জয়া আর কল্যাণ। অবোধ মন—বোঝালেও বোঝে না। ছুটতে চায় কেবল মরীচিকার পিছে। যাকে পাবার কোন আশা নেই, তার জন্যে কেন সে বিচলিত হয় ? ছিঃ ছিঃ, সে ভুলে গেল সেদিনের অপমান ? কিন্তু প্রেমের কাছে যে মান অপমান চিরকাল ধূলায় লুণ্ঠিত। এ কথাও কি ভুলে গেল অলোক ?

গাড়ীতে ব'সে জয়াও হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। বেচারী অলোক! সেদিনের আঘাতের পরেও এসেছে মিটিংয়ে। কেবল তাকে দেখতে পাবার আশায়। কিন্তু কেন এ আশা ? সেদিন নির্মম হাতে সে চূর্ণ ক'রে দিয়েছে সব—তবু এত অনুরাগ তার ওপর ? বাস্তবিকই সে ভাগ্যবতী। চমকে উঠল জয়া, না না, এ হতে পারে না। যতই ভালোবাসুক অলোক, তবুও সে তাকে বিয়ে কিছুতেই করতে পারবে না। চোখের সামনে তার মা, দিদিমার ব্যর্থ জীবনের তিল তিল মৃত্যু দেখেও আবার ও-পথে পা দেবে সে ? অসম্ভব।

কল্যাণ জয়ার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলে কেন জয়াদি ? কি ভাবছ ? শুনতে পারি কি ?"

"ভাবছি অনেক কথা কল্যাণ। সেদিন অলোকবাবু সমিতির জন্যে হাজার টাকার একটা চেক দিয়েছিলেন।"

"তাই নাকি ? খুব সুখবর।"

"আমি সে চেক তক্ষুনি ফিরিয়ে দিয়েছি।"

"ফিরিয়ে দিয়েছ ?" হতভম্বের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল কল্যাণ।

কয়েক মিনিট পর জয়া বললে, "তুমি ভাবছ বোধ হয় আমি কি নিষ্ঠুর!"

ক্রুদ্ধস্বরে কল্যাণ বললে, "শুধু নিষ্ঠুর নয়, অভদ্র। তাছাড়া কোন্ অধিকারে তুমি চেক ফিরিয়ে দিলে জয়াদি? চেক তিনি তোমাকে দেন নি। দিয়েছেন দুঃস্থ-সেবায়। তোমার মনের বিলাসের জন্যে তাদের বঞ্চিত করা কিছুতেই উচিত হয় নি। ঐ হাজার টাকায় তাদের বেশ খানিকটা উপকার হোত, তোমার খেয়ালী মনকে কণ্ট্রোল কর জয়াদি।"

দুঃখিত স্বরে জয়া বললে, "কেবল খেয়ালের বশেই ফিরিয়ে দিই নি ভাই, এর মধ্যে যথেষ্ট কারণও আছে। এ চেক অলোকবাবুর নিঃস্বার্থ দান নয়, এর পেছনে মস্ত এক প্রত্যাশা লুকিয়ে আছে।"

"কাজেই তুমি ফেরত দিয়ে তাঁকে অপমান করলে।"

"এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না কল্যাণ। তাঁর আশা পূরণ করা আমার পক্ষে একবারে অসম্ভব।"

"জয়াদি, আমি বুঝতে পারি না—কেন তুমি অসম্ভব মনে কর!"

"তুমি বুঝবে না কল্যাণ। আমি জানি আমাদের মিলন কষ্টের কারণ হবে। কাজেই সূচনাতেই নির্মূল করা দরকার।"

"ধ'রেই নিলাম, তোমাদের মিলন হতেই পারে না, কিন্তু তাঁকে অপমান করলে কেন? বুঝিয়ে বললেই হোত।"

"তিনি যদি প্রকাশ ক'রে বলতেন, নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতাম।"

মুখ ভার ক'রে কল্যাণ বললে, "যাই বল জয়াদি, তোমার উচিত হয় নি চেক ফিরিয়ে দেওয়া। অলোকবাবু খুব ভালো, তাই আবার মিটিংয়ে এসেছেন; শুধু এসেছেন নয়, তোমার সঙ্গে দেখাও করলেন। আমি হোলে তোমার ধার দিয়েও যেতাম না।"

গম্ভীর হয়ে বললে জয়া, "আত্মসম্মান থাকলে তাই করা উচিত।"

কল্যাণ বললে, "অলোকবাবু যথার্থই তোমায় ভালোবাসেন, তাই মান-মর্যাদা সবই তুচ্ছ করেছেন তোমার জন্যে।"

কল্যাণের কথাগুলি ঘুরে ফিরে কেবলই মনে হতে লাগল জয়ার। 'অলোকবাবু তোমায় ভালোবাসেন, তাই মান মর্যাদা সবই তুচ্ছ করেছেন তোমার জন্যে।'—ঠিক বলেছে কল্যাণ। চেক ফিরিয়ে দেবার পরও ওয়িলিংটনে মিটিং শুনতে যাওয়া বাস্তবিকই আশ্চর্য. ব্যাপার। কিন্তু কি করবে সে? তার কি করা উচিত? বারে বারে আঘাত দিয়ে ফেরাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না ফেরাতে। চ'লে যাবে কোথাও কলকাতা ছেড়ে? বন্ধুর বাড়ী? কিংবা মফস্বলে একটা চাকরী নিয়ে? যাতে ভুলে যেতে পারে অলোক তাকে? কিন্তু সে কি নিজে ভুলতে পারবে তাকে? হয়তো পারবে না কোনদিন, তবু অলোক ভুলে যায় যেন জয়াকে। অন্য মেয়েকে বিয়ে ক'রে সুখে ঘর-সংসার করুক, ঈশ্বরের কাছে এই তার কামনা।

:

অবুঝ মন, বোঝালেও বোঝে না। অলোক শত চেষ্টাতেও মনকে ঠিক করতে পারছে না। ভাবলে অলোক, একবার স্পষ্ট ব'লে দেখলে কেমন হয়? সে তো জানেই—হবে না, তবু একবার শেষ চেষ্টা। রত্ন পেতে হোলে প্রাণের আশা ছেড়ে ডুব দিতে হয় অগাধজলে। কাজেই দেখাই যাক শেষ বারের মতো, কি হয়!

অলোক জয়াকে আবার চিঠি দিলে, সে একবার দেখা করতে চায়। জয়া চিঠি পেয়ে বিব্রত হয়ে পড়ল। দেখা যখন করতে চান, তখন দিতেই হবে দেখা। কি ব'লে সে ঠেকাবে? ভগবান ভীষণ পরীক্ষায় ফেললেন তাকে। কেন দেখা করতে চান? কি বলতে চান? আবার হতে হবে নিষ্ঠুর বর্বর, নির্মম আঘাত দিয়ে ফেরাতে হবে তার জীবনসর্বস্বকে। ভগবান, শক্তি দাও প্রভু, দুর্বলতা দূর ক'রে দাও। এ নিষ্ঠুর খেলার এবারেই শেষ ক'রে দাও দয়াময়। ঝরঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়ল জয়ার চোখ দিয়ে। দিন কয়েক জয়া আর বের হতেই পারল না। কে যেন তার শরীর আর মনের

সব শক্তি কেড়ে নিয়েছে! মুখে রুচি নেই খাওয়ার, চোখে ঘুম নেই, মনে ফূর্তি নেই। দিন-রাত সেই একই চিন্তা, কি ক'রে আবার সে নির্দয় হবে অলোকের ওপর? তার বুকের পাঁজরা চুরমার ক'রে ভেঙে দেবে? অস্থির হয়ে পড়ল জয়া। শুকনো মুখ, চোখের কোলে কালি, দিনরাত থাকে শুয়ে, যেন ছ'মাসের রুগী।

রায়বাহাদুর চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বললেন গৃহিণীকে, "জয়ার কি হোল? বেরোয় না, ঠিকমতো খায় না, চঞ্চল মেয়ে আমার দিন-রাত বিছানায় প'ড়ে রয়েছে, একবার খোঁজ নাও। ডাক সন্তোষকে।"

গৃহিণী বললেন, "তুমি একটু ধৈর্য ধর, এ রোগ সন্তোষ ডাক্তার সারাতে পারবে না। ও এখন দ্বন্দ্বে পড়েছে অলোককে নিয়ে, কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। ওর জীবন-সমস্যার ওই করুক মীমাংসা।"

কয়েক দিন আকুল প্রতীক্ষার পর অলোক চিঠির জবাব পেলে। পরদিন সন্ধ্যায় তাকে জয়ার বাড়ীতে দেখা করতে বলেছে। যথাসময়ে সে এলো জয়াদের বাড়ীতে। আবোল-তাবোল অনেক কথা ব'লে গেল, কিন্তু আসল কথা মুখে আনতে পারল না।

জয়া শেষকালে বললে, "অলোকবাবু, আপনার কি কথা ছিল আমার সঙ্গে? বললেন না তো এখনও?"

অলোক একটু ইতস্তত ক'রে বললে, "ছিল একটা যাহোক কথা, তবে এখন থাক্। আজ না হয় আসি। পরে লিখেই জানাব।"

একটু চুপ ক'রে থেকে জয়া বললে, "আপত্তির যদি বিশেষ কারণ না থাকে, আর যাহোক কথাটা একান্তই আমাকে বলা দরকার মনে করেন, তবে এখন বলা ভালো নয় কি? চিঠিপত্র লেখার হাঙ্গামের আর দরকার কি?"

কয়েক মিনিট নীরব থেকে অলোক বললে, "সাহস হচ্ছে না মিস মিত্র, আপনি হয়তো রাগ করবেন।"

"আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি অলোকবাবু, একটুও রাগ করব না।"

তবুও কথাটা সহজভাবে অলোক কিছুতেই পাড়তে পারলো না। স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল।

জয়া শেষে অগত্যা বলতে বাধ্য হোল, "আচ্ছা লিখেই জানাবেন।"

অলোক বললে, "মিস মিত্র, যদি কিছু অন্যায় বলি, তাহলে বলুন আমায় ক্ষমা করবেন?"

"কি মুস্কিল! এমন কি সাংঘাতিক কথা, যার জন্যে আগে থেকেই ক্ষমা চাইলেন?"

এবার অলোক সাহস ক'রে মৃদুস্বরে বললে, "মিস মিত্র, যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আপনাকে পেলে আমি ধন্য হয়ে যাই।"

'ধন্য হয়ে যাই'! উত্তেজনায় জয়ার শরীর থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে সুরু হোল। নিজেকে প্রাণপণে সংযত ক'রে জয়া ভাবলে, এখনও কথা শেষ হয় নি। সে জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন সমস্ত ভাব উচ্ছ্বাস থামিয়ে চিন্তা ক'রে দেখা দরকার, কি তার করা উচিত, কি তার বলা উচিত! সে চোখ তুলে দেখলো, অনুরাগ-ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অলোক তার দিকে।

ধীর স্বরে বললে জয়া, "অলোকবাবু, আমার আদর্শ ভালো ক'রেই জানেন আপনি। আমাকে গ্রহণ করলে আপনার জীবনে দুর্ভাগ্য নেবে আসবার সম্ভাবনা বেশী। আপনাদের সঙ্গে মিলিয়ে চলা আমার হয়তো হয়ে উঠবে না। শেষে দুজনেরই জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

অলোক ব্যগ্র স্বরে বললে. "না না, আপনার কোনও ভয় নেই, মিস মিত্র। বেশ ভালো করে চিন্তা করেই বলছি, আপনার চলার পথে আমি প্রতিবন্ধক হব না মিস মিত্র।"

"প্রতিবন্ধক হয়তো হবেন না, কিন্তু উদাসীন থাকবেন—সেও তো বাঞ্ছনীয় নয় অলোকবাবু। এক মন, এক প্রাণ, এক আদর্শ না হতে পারলে, মিলনের কি কোন সার্থকতা আছে?"

অত্যন্ত নরম সুরে অলোক বললে, "উদাসীন থাকব না আমি। আমিও ঝাঁপিয়ে পড়ব কাজে আপনার সঙ্গে। জীবনে ব্যর্থতা আসতে দেব না কিছুতেই। আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না।"

জয়াও আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলে না। আর কত যুক্তি দেখাবে সে? তার নিশ্চেতন মন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এতদিন ধ'রে সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে যাকে কামনা ক'রে এসেছে, যাকে বারে বারে সে আঘাত হেনেছে, তবু যে মান অপমান সংশয় দ্বিধা—সব কিছু সরিয়ে বারে বারে তারই কাছে আসতে চায়, তাকে ফেরাবার ক্ষমতা আর তার নেই।

জয়া অবনত মুখে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

অতি মৃদু আর নরম সুরে অলোক বললে, "আশা আছে?"

রাগ-লজ্জার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণে জয়ার মুখ দীপ্ত হ'য়ে উঠলো। অলোকের আর উত্তরের প্রয়োজন হোলো না।